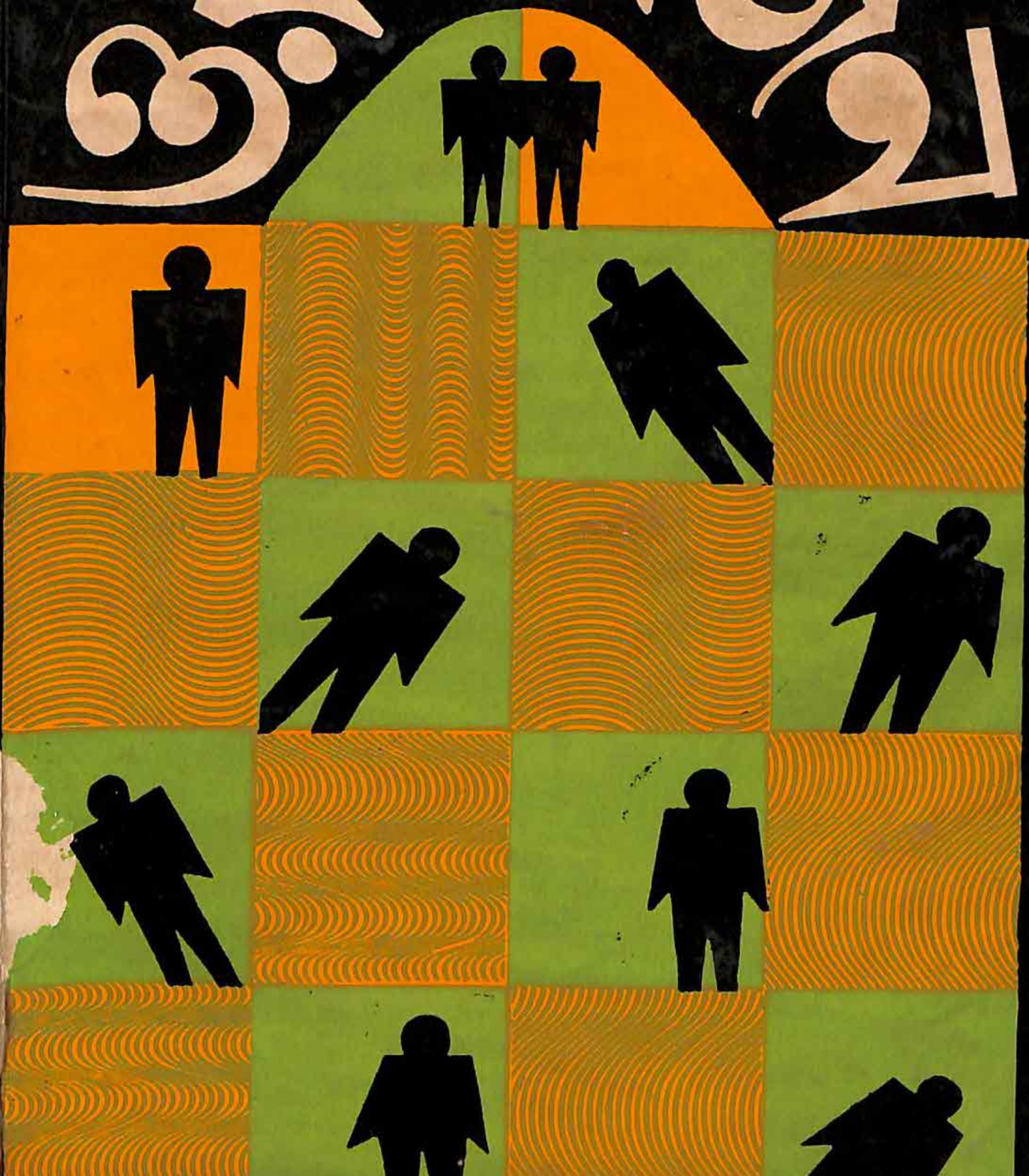
আগাথা ক্রিস্টি

ওরা দশজন



ওরা দশজন

ভাষান্তর/নির্মলকান্তি ঘোষ

বৈশাখী/কলকাতা

Based on Agatha Christie's 'Ten Little Niggers' and Bengali version by Nirmal Kanti Ghosh

প্রকাশ

জুন ১৯৮২

জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৯

প্রকাশক

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

বৈশাখী প্রকাশনী

২।১২৯ বিজয়গড়

কলকাতা-৭০০০৩২

মুদ্রক

মৃণালকান্তি রায়

রাজলক্ষ্মী প্রেস

৩৮সি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদপট

গৌতম রায়

পনের টাকা

বেঙ্গল ট্রেনিং ক্লাবের উদ্দেশ্যে

প্রচণ্ড গতিতে ট্রেনটা ছুটে চলেছে।

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মিঃ ওয়ারগ্রেভ প্রথম শ্রেণীর একটা ট্রেনের কামরায় বসে আছেন। তাঁর মুখে সিগার এবং হাতে খবরের কাগজ। কাগজের উপর থেকে চোখ তুলে তিনি বাইরের দিকে তাকালেন। অবশ্য তা নিমেষের জন্য। এখন সে দৃষ্টি হাতের ঘড়ির দিকে। ভাবলেন, নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছতে এখনো ত্ব'ঘণ্টা লেগে যাবে।

হঠাৎ মিঃ ওয়ারগ্রেভের চিঠির কথাটা মনে পড়ে যায়। তিনি পকেট থেকে চিঠিটা বার করলেন। অস্পষ্ট চিঠি। হাতের লেখাও তেমন সুবিধের নয়। অবশ্য কিছু বাদ-সাদ দিয়ে পড়লেও কোন অসুবিধে হয় না। বক্তব্য ঠিক বোঝা যায়।

মিঃ ওয়ারগ্রেভ চিঠিটা পড়তে শুরু করলেন—

প্রিয় লরেন্স,

...বহুদিন তোমায় দেখিনি, সেই সঙ্গে তোমার খবর ...পান্না দ্বীপে তোমার অবশ্যই আসা চাই...। পরিবেশ ভারি মনোরম...তোমার জন্য অনেক কথা জমা হয়ে আছে...পুরনো কথা...প্রকৃতি...ঝলমলে রোদ...১২-৪০-এ প্যাডিংটন......ওকব্রিজে দেখা হবে...

প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইলো।

কন্‌স্টান্স কালমিংটন

চিঠিটা ভাঁজ করে মিঃ ওয়ারগ্রেভ ভাবতে চেষ্টা করেন, কতদিন আগে এই পত্রলেখিকার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল। সাত আট বছর আগে? হ্যাঁ, মনে পড়েছে। পরিচয় হয়েছিল ইতালিতে।

ভদ্রমহিলা একটু খেয়ালী। তাতে অবশ্য আশ্চর্য হবার কোন কারণ নেই। আর তিনিই হয়তো পান্না দ্বীপটা কিনেছেন।

এই ছোট্ট দ্বীপটার কথা ইদানীং প্রায় খবরের কাগজে দেখা যায়! আগে এটার মালিক ছিল এক লক্ষপতি। মোটরবোটে ভেসে বেড়ানো তাঁর শখ ছিল। এখানে একটি সুন্দর বাড়িও করেছিলেন। তাতে আধুনিকতার ছাপ। পরে যে কোন কারণেই হোক বাড়িটা তিনি বেচে দেন। তার জন্য কাগজে বিজ্ঞাপনও ছিল। তবে কে কেনে তা নিয়ে অনেক কথা রটেছে। কেউ বলে, কোন চিত্রাভিনেত্রী কিনেছে। উদ্দেশ্য, নির্জনতায় বাস করা। অনেকের ধারণা, সরকার নৌবহরের কাজের জন্য কিনেছে। আবার এ খবরও শোনা যায়, মিঃ আওয়েন নামে এক ধনী ব্যক্তি বর্তমানে এই দ্বীপের মালিক।

মিঃ ওয়ারগ্রেভ এতক্ষণ দ্বীপের কথা ভাবছিলেন। চিঠির কথাও। এবার পা দুটো সামনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বেশ আরাম করে বসলেন। সিগারটা রাখলেন ছাইদানিতে। দু' চোখে একটা ঘুমের রেশ।

২

বিশ্রী গরম পড়েছে। এই গরমের মধ্যে ট্রেনে যাওয়া যায়! একথা ভাবছে ভেরা ক্লেথর্ন। আবার পাঁচজনের সঙ্গে একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় সে বসে আছে। তারপরই তার মনটা প্রসন্নতায় ভরে উঠলো। এ সময় সমুদ্রতীর দারুণ ভালো লাগবে। আর এই কাজটা পেয়ে সে খুব খুশী। এটা তার মনের মত কাজ। চাকরিটা প্রাইভেট সেক্রেটারির। তবে মাত্র এক মাসের জন্য। তাই বা মন্দ কী! সে স্কুল থেকে এক মাসের ছুটি নিয়েছে। এ ক'দিন বাচ্চাদের চিৎকার এবং রুটিন মাফিক কাজের হাত থেকে তো রেহাই পাবে।

ভেরা কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেই আবেদন করেছিল। তবে হবে কিনা তা নিয়ে মনে বেশ সংশয় ছিল। নিয়োগ-পত্র এলো। পুরু কাগজে ঝকঝকে টাইপে চিঠি।

সুচরিতাসু,

আপনার আবেদন পত্রের সঙ্গে আপনার প্রশংসা পত্রগুলো পেয়েছি। এ থেকেই বুঝতে পারছি, আপনি যোগ্য লোক। আর আপনি যা মাইনের কথা বলেছেন তাইই পাবেন। ৮ তারিখ থেকে কাজে যোগদান করলে খুশী হবো। প্যাডিংটন থেকে ১২-৪০-এ ট্রেন। ওকব্রিজ স্টেশনে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে। এই সঙ্গে আপনার পথ খরচের টাকাও পাঠালাম।

ধন্যবাদান্তে,

ইতি,

উনা নান্‌সি আওয়েন

হঠাৎ ভেরার মনে হলো, এখানে না লেগেই হয়তো সে ভালো করবে। যদিও সমুদ্র সুন্দর, কিন্তু গভীর। পরক্ষণে তার হুগোর কথা মনে পড়ে যায়। এরপরই ওকে মন থেকে ছেঁটে দেয়। এলোমেলো ভাবনা থেকে মনটা ট্রেনের কামরার দিকে ফেরায় ভেরা। দৃষ্টি যায় সামনের লোকটির দিকে। লোকটি বেশ লম্বা-চওড়া। গায়ের রং তামাটে। মুখটা কেমন যেন নিষ্ঠুর। আর ভেরার ধারণা, লোকটি অনেক দেশ ঘুরেছে এবং দেখেছেও অনেক কিছু।

৩

ভেরার সামনে বসা লোকটির নাম ফিলিপ লম্বার্ড। ভাবে, ভেরা সুন্দরী। তবে মুখে একটা মাস্টারনী ছাপ। অবশ্য লম্বার্ড এখন এ সব কথা ভাবতে চায় না। তার কাজের কথা ভাবা উচিত। আর কাজটা নেবার আগের কথাবার্তা তার মনে পড়ছে।

—কাজটা ইচ্ছে হলে নিতে পারেন, আবার নাও পারেন ক্যাপ্টেন লম্বার্ড।

এর জবাবে লম্বার্ড বলেছিল, টাকাটা আট হাজারের বেশী হলে ভালো হতো। অবশ্য এখন যা তার অবস্থা তাতে তার কাছে ঐ

টাকাটা কম নয়। তবু সে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মরিসকে রাজি করাতে পারেনি।

তারপর লম্বার্ড বললো, এ চাকরির ব্যাপারে আপনি আমায় আর কিছু বলতে পারছেন না ?

—না। আপনি আমার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেন, মরিস জানায়। আমার মক্কেল আপনার বিশেষ পরিচিত। তিনি আপনাকে এ টাকাটা দিতে বলেছেন। আপনি ডেভনের পান্না দ্বীপে যাবেন। ওর কাছের স্টেশন হলো ওকব্রিজ। ওখান থেকে আপনি পান্না দ্বীপে যাবেন মোটর বোটে করে। বোট গিয়ে দেখতে পাবেন। এরপর আমার মক্কেলের সঙ্গে আপনার কথাবার্তা হবে।

—এই কথাবার্তায় কতদিন লাগবে বলে মনে হয়, লম্বার্ডের জিজ্ঞাস্য।

—দিন সাতেক।

—আশা করি বেআইনি কিছু করতে আমায় বলা হবে না।

—হলেও তা করা না করা আপনার উপর নির্ভর করবে, মরিস গম্ভীর ভাবে উত্তর দেয়।

তার পরমুহূর্তে লম্বার্ড ভাবে, জীবনে সে তো বেআইনি কিছু করেনি ? যাক্ এখন ওসব কথা। সে এখন কাজের কথা ভাববে। ছুটিতে পান্না দ্বীপে তার ভালোই কাটবে।

৪

এই ট্রেনের আর এক কামরায় মিস গম্ভীরাননা বসে আছেন। অবশ্য এটা ওঁর পিতৃদত্ত নাম নয়। ওঁর পরিচিত মহল ওঁর মেজাজের জন্য ঐ নাম দিয়েছে। ওঁর আসল নাম এমিলি ব্রেন্ট। বয়স পঁয়ষট্টি। চিরকুমারী। ওঁর বাবা সে আমলের ফৌজী কর্নেল। তাঁর মেজাজ এবং ব্যবহার সবাই পৈতৃক সূত্রে পাওয়া।

হাল আমলের ছেলে-মেয়েদের তিনি একবারে দেখতে পারেন না। ছেলেগুলো অপদার্থ। চলনে বলনে আড়ষ্ট। শিষ্টাচারের

বালাই নেই। ইজিচেয়ার বা কুশন ছাড়া বাবুরা বসতে পারেন না। খালি ওষুধ খাচ্ছে। নাকি ওদের ঘুম আসে না। আর মেয়েগুলোও বদের ধাড়ি। জামা-কাপড় ছেঁটে ছেঁটে কোথায় নামিয়েছে! আর সমুদ্রের ধারে সারি সারি শুয়ে থাকে। নাকি রোদ পোয়ায়। তা একটু ভদ্রভাবে শুয়ে থাক্! না, সুইমিং কস্টিয়ুম পরে শুয়ে আছে। ওতে কী আর কাপড় আছে! যত সব বদ মেয়ে মানুষ! এই তো গতবার গরমের সময় সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, কয়েকদিন থাকবেন। তা কী আর হবার উপর ছিল! ওদের কাণ্ডকারখানা দেখে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে এবার তাঁর ভাগ্য ভালো। একটা চমৎকার আমন্ত্রণ পেয়েছেন—

মহাশয়া,

আশা করি আমায় ভুলে যাননি। কয়েক বছর আগে বেলহাভেনের এক অতিথি-নিবাসে একসঙ্গে থাকার সময় আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তখন আপনার সঙ্গে আমার মতের ও রুচির মিল হওয়ায় গর্ববোধ হয়েছে।

ডেভনের কাছে আমি নিজেই একটা অতিথি-নিবাস খুলছি। সেখানে আপনাদের মত রুচিসম্পন্ন লোকেরা থাকতে পারবেন। এখানে আধুনিকতার কোন প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। বেশবাস ভদ্র হবে। আর মাঝ রাত পর্যন্ত মদ খেয়ে নাচ গানও করা চলবে না।

আপনি আমার অতিথি-নিবাসে যদি দয়া করে পায়ের ধুলো দেন তো খুশী হবো। আপনি আমার বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন। আগস্ট মাসের আট তারিখে আসতে কি অসুবিধে হবে?

আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি,

ইউ. এন. ও.

চিঠিটা পেয়ে এমিলি দারুণ খুশী হয়েছেন। বছর দুই আগে বেলহাভেনে

গিয়েছিলেন। ওখানে মাঝ বয়েসী এক মহিলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। তার নাম ও পদবী কিছুই তাঁর মনে পড়ছে না। বুড়ো হলে এই এক জ্বালা। শুধু স্মৃতির পাতা হাতড়ে বেড়াও। তাও কী আবার সব সময়ে মনে পড়ে!

৫

অন্য একটা ট্রেন। জেনারেল ডগলাস জানলার কাছে বসে আছেন। শাখা লাইনের ট্রেনগুলো বড্ড আস্তে চলে। অথচ এখন থেকে পান্না দ্বীপ কতই বা দূরে! অথচ কত সময় লাগিয়ে দিচ্ছে! তারপর তিনি ভাবেন, আওয়েন লোকটি কে? তিনি কিছুতেই চিনতে পারছেন না। তবু তাঁর চিঠি পেয়েই ওখানে চলেছেন। তাতে লেখা আছে—

পুরনো বন্ধুরা কয়েকজন আসছেন। আপনিও চলে আসুন না। খারাপ লাগবে না। অতীতের কথা নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

হারানো দিনের কথা নিয়ে আলোচনা করতে জেনারেলের ভালোই লাগবে। শুধু রিচমঙ্গ প্রসঙ্গ বাদে। প্রায় ত্রিশ বছর আগের বিষাক্ত অতীত। আর এই ট্রেনটা একেবারে জ্বালিয়ে মারলে! ভীষণ আস্তে চলছে। এখনো এক ঘণ্টা লেগে যাবে।

৬

সল্স্বেরি থেকে একটা ঝকঝকে মরিস গাড়ি দ্রুত ছুটে চলেছে। চালাচ্ছেন ডাঃ আর্মষ্ট্রং। সুন্দর চেহারা। তেমনি ওঁর সাজ-পোশাক। তবে ওঁকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। এই ক্লান্তি কি গাড়ি চালাবার জন্য? তা হয়তো নয়। এ ক্লান্তি সাফল্যের। এই খ্যাতি একদিনে তাঁর জীবনে আসেনি। দিনের পর দিন চেম্বার তাঁর ফাঁকা গেছে। তারপর ভাগ্যদেবী তাঁর সহায় হয়েছেন।

ডাঃ আর্মষ্ট্রং মেয়েদের প্রতি কৃতজ্ঞ। তাঁর প্রতিষ্ঠার মূলে মেয়েদের প্রচার। বেচারী পামেলা কত চিকিৎসা করিয়েছে।

সারছিল না কিছুতেই। বয়সে তরুণ হলেও ডাক্তার প্রথম দিনই তাঁর রোগ ধরে ফেলেছিলেন। তারপর এক মাসের মধ্যে পামেলা সেরে উঠলো।

খ্যাতির বিড়ম্বনাও আছে। ডাক্তার একটুও অবসর পান না। অবশ্য তাতে তিনি অখুশী নন। তবে পান্না দ্বীপ ডাক পেয়ে তিনি খুশীই। এখানে রোগীও দেখা যাবে, সেই সঙ্গে একটা নির্জন পরিবেশের সুখ উপভোগ করতে পারবেন।

ওখানে তাঁর রোগী মিসেস আওয়েন। মিঃ আওয়েন ডাক্তারকে অনেক অনুরোধ করে চিঠি দিয়েছেন। পাঠিয়েছেন অগ্রিম দক্ষিণাও। তাঁর স্ত্রী নার্ভাস ব্রেকডাউনে ভুগছেন। এই কথাটা শুনে ডাক্তারের হাসি পায়। অবশ্য এ ব্যাপারে বিশ্বাসটাই আরোগ্যের একমাত্র চাবি কাঠি। আর সেটা করতে হয় ডাক্তারকেই।

তবে এই ডাক্তারের সাফল্যের ইতিহাসের পিছনে একটা কলঙ্কময় অধ্যায়ও আছে। তারপর থেকে আর কোনদিন পানপাত্র স্পর্শ করেননি। আগের তুলনায় সতর্কও হয়েছেন অনেক বেশী।

ডাক্তারের চিন্তায় ছেদ পড়লো। একটা বড় ট্রাক তাঁর গাড়ির দিকে আসছে। তিনি গাড়িটাকে রাস্তার একবারে পাশে নিয়ে গিয়ে ওকে জায়গা দিলেন। উদারতা ছাড়া আর কী! ট্রাকটা বিশ্রীভাবে ড্রাইভ করে বিজয় গর্বে যেন চলে গেল।

৭

বেপরোয়া ভাবে ড্রাইভ করা অ্যাণ্টনি মার্সটনের অভ্যেস। তাই বলে বলা চলে না সে বাজে ভাবে ড্রাইভ করে। তবে সত্যি কথা বলতে কি, ইংল্যাণ্ডে গাড়ি চালিয়ে বিন্দুমাত্র সুখ নেই। কন্টিনেন্টে গাড়ি চালিয়ে যা আনন্দ, সে সুখ এখানে নেই। এখানে গাড়ি তো চলে না, যেন হামাগুড়ি দিয়ে গরুর গাড়ি চলছে।

ভাবে, একটু থামবে নাকি? পান্না দ্বীপের মাত্র আর একশো মাইল বাকী। এটা তার কাছে কিছুই না। বরং এখন গলাটা

একটু ভিজিয়ে নেওয়া যাক্।

একটা কফি বারের কাছে সে গাড়িটা পার্ক করে। তার সুন্দর স্বাস্থ্যর দারুণ তরুণী মহলে গুঞ্জন ওঠে।

৮

ব্লোর প্লাইমাউথ থেকে একটা মন্থর গতির ট্রেনে করে চলেছে। কামরায় আর একটি মাত্র মানুষ আছে। সে একটা নাবিক বৃদ্ধ। বসে বসে সে ঝিমচ্ছে।

ব্লোর পকেট থেকে একটা ছোট্ট নোট বই বার করলো। একটা তালিকার উপর সে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে থাকে। সেই তালিকায় রয়েছে—এমিলি ব্রেনট্, ভেরা ক্লেথর্ন, ডাঃ আর্মস্ট্রং, অ্যান্টনি মার্সটন, বিচারপতি মিঃ ওয়ারগ্রেভ, ফিলিপ লম্বার্ড, জেনারেল ডাগলাস, পরিচালক রজার্স এবং তার স্ত্রী।

এই তালিকা দেখে ব্লোর ভাবে, নিজের নামটা তার কোথায়! তারপর কামরার আয়নায় নিজেকে একবার দেখে নেয়। ভাবলো, আমি তো একজন রিটায়ার করা ফৌজী অফিসার হতে পারি। পরক্ষণেই এটা সে মন থেকে বাতিল করে দিল। দলের মধ্যে এতজন জেনারেল রয়েছে। তাহলে উপায়?

অবশ্য উপায় একটা আছে। হ্যাঁ, সে হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার একজন বিশিষ্ট নাগরিক। খাঁটি ইংরেজ তো বটেই। এখানে তার ব্যবসার ক্ষেত্র। আর সে বাজী ধরে বলতে পারে, দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে এদের কারুর জ্ঞান নেই। সে নিজে কী কিছু জানতো? ভ্রমণ কাহিনী পড়ে কয়েকদিন আগে যা জেনেছে।

হঠাৎ ঐ বুড়ো নাবিক কেশে নড়ে চড়ে বসলো এবং নিজের মনেই বিড়বিড় করতে থাকে, সমুদ্র বড় বিচিত্র। এর কাণ্ডকারখানা আগেভাগে কেউ বলতে পারে না।

—তা তো বটেই, ব্লোর ওর কথায় সমর্থন জানায়। বুড়োটা কয়েকবার খুক খুক করে কাশলো। তারপর কাশির বেগ সামলে

বলে, ঝড় আসছে।

—ঝড় ? এখন তো দারুণ ভালো আবহাওয়া।

—বলছি ঝড় আসছে, বুড়ো খেঁকিয়ে ওঠে। গন্ধ পাচ্ছি।

—হতে পারে, ব্লোর বুড়োকে আর ঘাঁটায় না।

—ভাবো, সেই শেষের ভয়ঙ্কর দিনের কথা।

ব্লোর ভাবে, তুমি তোমার শেষের দিনের কথা ভাবো। আমার ভাবতে বয়ে গেছে। আমার এখন অনেক বাকী।

দুই

ওকব্রিজ স্টেশনের বাইরের দিক।

ছোটখাটো একটি দল দাঁড়িয়ে। দলে আছে চারজন। এদের কারুর সঙ্গে কারুর পরিচয় নেই। সকলের মুখে একটা অস্বস্তির ছাপ ফুটে উঠেছে। প্রত্যেকের পিছনে একটা সুটকেশ নিয়ে কুলী দাঁড়িয়ে আছে।

অদূরে ছুটো ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যে একজন চালক এগিয়ে এসে বললো, আপনারা পান্না দ্বীপে যাবেন তো ?

—হ্যাঁ, সবাই মাথা নাড়ে এবং একে অপরকে দেখে নেয়। এদের মধ্যে মিঃ ওয়ারগ্রেভ বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারার মানুষ। তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে ড্রাইভার বললো, স্যার, এখানে ছুটো ট্যাক্সি আছে। তার মধ্যে একটাকে এখানে অপেক্ষা করতে হবে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে এক্সেটার থেকে একটা ট্রেন আসবে। তাতে একজন ভদ্রলোক আসছেন। আপনাদের মধ্যে একজন তাঁর জন্য অপেক্ষা করে বাকীরা আ মার সঙ্গে চলুন। এ ব্যবস্থায় আপনাদের সুবিধেই হবে।

—আমি অপেক্ষা করছি, ভেরা ক্লেথর্ন বললো। আপনারা যান।

—ধন্যবাদ! গাড়িতে উঠে বসলেন মিস গম্ভীরানন্দা।

তাঁকে অনুসরণ করলেন মিঃ ওয়ারগ্রেভ।

—আমি না হয় আপনার সঙ্গে অপেক্ষা করি, ভেরার দিকে তাকালো লম্বার্ড। আপনার একা একা খারাপ লাগতে পারে।

ওদিকে কুলীরা মালপত্তর গোছাচ্ছে। হঠাৎ মিস গম্ভীরাননার উদ্দেশ করে মিঃ ওয়ারগ্রেভ বল্লেন, আবহাওয়া বেশ ভালোই মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ, মনে মনে তিনি খুশী হলেন।

—এই অঞ্চলটা আপনার পরিচিত কি ?

—না, ডেভনে আমার এই প্রথম আসা।

—আমিও।

ট্যাক্সি ছুটে চলেছে।

ওদিকে দ্বিতীয় ট্যাক্সির ড্রাইভার ভেরা এবং লম্বার্ডকে বলে, আপনারা গাড়িতে বসে বিশ্রাম করতে পারেন।

—না, ভেরা বলে, বাইরেটাই ভালো।

—ঐ বেঞ্চিটায় গিয়ে বসলে হয় না ? লম্বর্ড বলে। তবে আপনি ওয়েটিং রুমে গিয়েও বসতে পারেন।

—বদ্ধ ঘরে ঢুকতে একবারে মন চাইছে না।

—ঠিকই বলেছেন।

একটু চুপ করে থেকে লম্বার্ড ফের বলে, আপনি এর আগে এখানে এসেছেন ?

—না। তারপর বলে, যার কাজ করবো বলে এখানে এসেছি এখন পর্যন্ত তাকে দেখাই হলো না।

—মানে ?

—আমি মিসেস আওয়েনের সেক্রেটারি।

—ও, আচ্ছা, আচ্ছা। তাঁর সঙ্গে আপনার আদৌ পরিচয় নেই। এটা ভাবতে যেন কেমন লাগছে।

—অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাঁর সেক্রেটারী অসুস্থ হওয়ায় তিনি এক মাসের জন্য একজন সেক্রেটারী চেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন

দিয়েছেন। আমি তা দেখেই…।

—আচ্ছা, কিন্তু কাজটা যদি মনের মত না হয়?

—ওটা কোন ব্যাপার নয়, ভেরা হাসলো। আসলে ছুটি কাটাতে আসা। আমি একটা স্কুলে কাজ করি। ওটা স্থায়ী চাকরি। কিন্তু আপনার নামটা… ?

—আমার নাম ফিলিপ লম্বার্ড।

ভেরা তার নাম জানিয়ে বলে, মিঃ লম্বার্ড, আপনি তো আওয়েনদের সঙ্গে পরিচিত। ওঁরা কেমন লোক বলুন তো?

সঙ্গে সঙ্গে লম্বার্ড অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। আসলে প্রশ্নটা সে এড়িয়ে যেতে চায়। ওঁদের সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। তাই সে ভাবটা এমন দেখায় যেন সে শুনতেই পায়নি। এরপর সে দূরের সিগন্যালের দিকে দৃষ্টি ফেরায়।

দূরে একটা কালো বিন্দু দেখা যাচ্ছে। কাছে আসতে বোঝা গেল এটা একটা ট্রেন। ট্রেনটা স্টেশনে ইন করার পর প্ল্যাটফর্ম থেকে বিরাট চেহারার এক বয়স্ক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। পরনে তাঁর নিখুঁত স্যুট। চালচলন ফৌজীর মতন। উনি হচ্ছেন জেনারেল ডগলাস।

ভেরা তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে অভিবাদন জানিয়ে বলে, আপনার জন্য গাড়ি অপেক্ষা করছে। আমি মিসেস আওয়েনের সেক্রেটারী। আর আমার সঙ্গে ইনি হলেন মিঃ লম্বার্ড।

লম্বার্ডের দিকে তাকালেন জেনারেল। ওর চেহারাটা চলনসই। তবে লোকটি সাধারণ নয়। কিছুটা ব্যক্তিত্ব রয়েছে। এরপর দু'জন দু'জনকে সম্ভাষণ বিনিময় করলো।

তারপর তিনজনে ট্যাক্সিতে ওঠার পর ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। ওকব্রিজের নির্জন পথ দিয়ে ট্যাক্সি ছুটে চলেছে। গ্রামটা যেন সকালের মিষ্টি সোনালী রোদ গায়ে মুখে মহা সুখে নিদ্রা যাচ্ছে। চারপাশে ছোট ছোট পাহাড়ের সারি।

—কী সুন্দর! ভেরা উল্লসিত হয়ে ওঠে।

—হ্যাঁ, পরিবেশটা বেশ মনোরম, জেনারেল জানায়। তবে এ জায়গাটা আমার অচেনা।

লম্বার্ড কিন্তু অন্য রকম মন্তব্য করে। বলে, এই পাহাড়ের ঘেরা জায়গা আমার আদৌ ভালো লাগে না। মনে হয় যেন আমায় গিলতে আসছে। সেই সঙ্গে একটা অস্বস্তি আমায় কুরে কুরে খাচ্ছে। আর জানতে ইচ্ছে করে ওপারে কি আছে। কিন্তু তার কোন উপায় থাকে না। এটাও একটা বিশ্রী ব্যাপার।

ট্যাক্সি উর্ধ্বশ্বাসে ধেয়ে চলেছে।

২

ট্যাক্সি অবশেষে এসে থামলো সমুদ্রতীরে। জায়গাটা নির্জন। অদূরে কয়েকটা কুটির ইতস্তত ভাবে ছড়ানো। এখানে ওখানে জাল সারানো চলেছে। অর্থাৎ জায়গাটা জেলে পাড়া।

এখানে একটা ছোট দোকান ঘর রয়েছে। এটা চায়ের দোকান। মাঝি-মাল্লাদের আড্ডার জায়গা। আবার যারা বোটে করে যায় এখানে তারা বিশ্রামও করে।

ট্যাক্সি থেকে ভেরারা নেমে দেখলো, ঐ চায়ের দোকানে তিনজনে বসে আছে। ওরা নিজেদের মধ্যে হাত-পা নেড়ে নেড়ে কি যেন বলছে। ভেরা এগিয়ে যেতে ওরা বললো, আমরা আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছি। আরে এই দেখুন, আমাদের পরিচয় জানাতেই ভুলে গেছি। আমার নাম ডেভিস। থাকি দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যাটালে।

লোকটার কথা বলার ভঙ্গি দেখে বিরক্ত হবার কথা। বিচারপতি ওয়ারগ্রেভকে মনে হলো, এখুনি বুঝি হাতুড়ি ঠুকে বিচার কক্ষ স্তব্ধ করে দেবেন। তার সঙ্গে অস্বস্তি বোধ করলেন মিস গম্ভীরাননা। তিনি মনে মনে বলে ওঠেন, লোকটা শিষ্টাচার বলতে কিছুই জানে না।

আবার ডেভিস কথা বলে ওঠে, কিছু মেয়ে নিলে হতো না ? তার কথায় কেউ কোন উত্তর না দিতে সে বোটের চালকের দিকে তাকিয়ে সুর করে বললো, আমাদের দয়া করে পার করে দাও। কথা শেষ করে নিজের রসিকতায় নিজেই হোহো করে উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে। বলা বাহুল্য, অন্য সবাই নীরব রইলো।

ওর কথা শুনে মোটর বোটের চালক এগিয়ে এলো এবং সবাইকে বোটে উঠতে ইঙ্গিত করলো। একটা চৌকো পাথরে বোটটা বাঁধা।

—উঠে আসুন সকলে, আবার গলা চড়ালো সেই বিরক্তির ডেভিস। আমাদের সকলের জন্য হয়তো আমন্ত্রণকর্তা এবং কর্ত্রী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

ওঁরা কী সত্যিই তাদের জন্য অপেক্ষা করছেন ? তবে তারা যে উৎসাহ মনে নিয়ে এখানে এসেছে সে উৎসাহে কী ভাঁটা পড়েনি ? আর এই জায়গাটা দেখে সবার মনে কী বিস্ময় এবং এক অদ্ভুত ধরনের শিহরণ মনে জাগেনি ? আর এর পিছনে কী ভয়ের কোন কারণ রয়েছে ? এবং সকলেই কী ভাবছে, ওখানে গিয়ে কাজ নেই। ঘরেই ফেরা যাক্ ?

সকলকে যেন চমকে দিয়ে বোট চালক বললো, আপনারা দয়া করে উঠে আসুন। যদিও আরো দু' জনের আসার কথা আছে। এ কথা জানিয়েছেন মিঃ আওয়েন। তবে তাদের জন্য এখন অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই।

—কিন্তু বোটে কি আমাদের সকলের জায়গা হবে। মিস গম্ভীরাননা জিজ্ঞেস করলেন ?

—নিশ্চয়ই হবে। এর দ্বিগুণ লোকও যেতে পারেন।

বোটটা ছাড়তে যাবে ঠিক তখনই সমুদ্রতীরে প্রচণ্ড গতিতে চালিয়ে এসে একটা সুন্দর গাড়ি থামলো। সেই গাড়ি থেকে নেমে এলো এক অপরূপ মানুষ। তার তুলনা শুধু যেন গ্রীক ভাস্কর্যে মেলে। তার নাম অ্যান্টনি মার্সটন। তারপর সে বোটে উঠতে বোটটা ছেড়ে দিল।

৩

এখান থেকে পান্না দ্বীপের সবটা দেখা যাচ্ছে না। সামনেই একটা ছোট্ট পাহাড়, সেটা আড়াল করে রেখেছে। তারপর দ্বীপের কিছুটা ঘুরে বোটটা গিয়ে থামলো দুটো বড় পাথরের মাঝে। জায়গাটা নির্জন ও সুন্দর। তবে নিরাপদ। আর অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন, সমুদ্র খারাপ থাকলে এখানে বোট লাগানো সম্ভব হয় না।

একই কথা লম্বার্ড বোট চালককে জিজ্ঞেস করতে সে বললো, সমুদ্রে জল ঝড় থাকলে পান্না দ্বীপ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

একে একে সবাই নামলো। তারিফ করার মত জায়গা। আর যে এখানকার মালিক তাঁরও রুচির প্রশংসা করতে হয়। তিনি ফুল ফলের গাছ, পাতা বাহার, পাম, সুন্দর সুন্দর বাগান, আর একটা চমৎকার বাড়ি তৈরি করেছেন। তবে এটাকে বাড়ি না বলে প্রাসাদ বলা ঠিক হবে। আর তাতে রয়েছে আধুনিক স্থাপত্যের নিখুঁত নিদর্শন।

—দয়া করে আপনারা এদিকে আসুন, বয়স্ক পরিচালকটি ওদের দিকে তাকিয়ে বলে। তার কথা বলার ভঙ্গি এবং আদব-কায়দা কেতাদুরস্ত। অর্থাৎ এ থেকে একটা কথা স্পষ্ট যে, বড় ঘরে কাজ করার নিয়ম কানুন সে বেশ ভালো ভাবেই রপ্ত করেছে।

সকলে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করলো। সামনেই একটা বিরাট হলঘর। সেখানে একটা টেবিল, তাতে অনেক পানীয় রয়েছে।

—আপনারা এখানে বিশ্রাম করুন, আমার নাম রজার্স। মিঃ আওয়েন দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছেন, তিনি আজ আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না। আগামী কাল দুপুরের মধ্যে এসে যাবেন। আমি এবং আমার স্ত্রী আপনাদের দেখাশুনো করবো। আর আপনাদের যাতে কোন অসুবিধে না হয় সে ব্যবস্থা তিনি করে গেছেন। আপনাদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা ঘর। এবার আপনারা অনুমতি দিলে আমি অন্য কাজে যেতে পারি। আটটায় ডিনার।

ভেরা সিঁড়ি দিয়ে উপরেউ ঠছে। তার আগে রজার্সের স্ত্রী। সামনে টানা বারান্দা। রজার্সের স্ত্রী একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। তারপর দরজা খুলে বললো, এটা আপনার ঘর। পছন্দ হয়েছে তো ম্যাডাম?

চমৎকার, আর সাজানোও সুন্দর করে। ঘরের সঙ্গে লাগানো ছোট বাথরুম। জানলা পথে সমুদ্র দেখা যায়।

তাই ভেরা হেসে বলে, হ্যাঁ, পছন্দ হয়েছে।

—আপনার কিছু প্রয়োজন হলে দয়া করে বেল বাজাবেন।

—আচ্ছা, আর আমি হলাম মিসেস আওয়েনের সেক্রেটারি। আমার কথা নিশ্চয়ই তুমি তাঁর কাছে শুনেছো।

—না ম্যাডাম। আমি এ ব্যাপারে কিছু জানি না। আমরা একটা তালিকা পেয়েছি। তাতে লেখা ছিল কে কোন ঘরে থাকবেন। আর আমি এখন সেই মত......।

—মিসেস আওয়েন আমার কথা আলাদা করে কিছু লেখেননি?

—না ম্যাডাম, আর আমরা এখানে এসেছি মাত্র দু'দিন হল।

ভেরা বেশ বিরক্ত। ভাবে, অদ্ভুত লোক তো এই মিসেস আওয়েন। তারপর সে বলে, তোমরা এখানে ক'জন কাজের লোক?

—আমরা দু'জন। আমি রান্নার কাজটা বেশ ভালো ভাবেই চালিয়ে নিতে পারি, আর আমার বুড়ো ঘরের অন্য কাজে ওস্তাদ। তাই আপনাদের কোন অসুবিধে হবে না।

—আমরা দশ জন, তার উপর আবার মিঃ এণ্ড মিসেস আওয়েন আসবেন। এত জনের কাজ তোমরা করতে পারবে?

—তা পারবো। তবে ওর থেকে বেশী হলে অসুবিধে হবে।

—হুঁ।

—এবার আমি একটু কিচেনে যাই।

—এসো।

রজার্সের স্ত্রী ধীরে ধীরে পা ফেলে চলে গেল। ও আস্তে আস্তে আস্তে কথা বলে। চোখ মুখ ফ্যাকাসে। বোধ হয় ও রক্ত শূন্যতায় ভুগছে। মনে হয় একটা ভয়ে ও কুঁকড়ে রয়েছে। কিন্তু কিসের ভয় ? আর কেনই বা ও ভয় পাচ্ছে ? ভেরা ভাবে।

৫

ডাঃ আরমস্ট্রং যখন পান্না দ্বীপে হাজির হলেন তখন সূর্য অস্ত গেছে। এখানে তিনি এসেছেন বোটে করে। বোট চলেকের নাম নারাকট। তাকে তিনি মিঃ আওয়েনের সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞেস করেছেন। তাতে ও জানিয়েছে, মালিক কে তা ও জানে না। তবে ভালো হবে মনে হয়। তার বোটের ভাড়া আগাম মিটিয়ে দিয়েছে এবং কিছু বেশীই দিয়েছে। তারপর ডাক্তার আবহাওয়া, মাছ ধরা ইত্যাদি নানা কথা ওকে জিজ্ঞেস করেন।

ডাক্তার খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। এখন তাঁর বিশ্রামের দারুণ ভাবে প্রয়োজন। কিন্তু তার কী উপায় আছে। কাজ আর কাজ।

ডাক্তার দ্বীপটির চারদিকে তাকান। অন্ধকারে তেমন কিছু দেখতে পেলেন না। তাতে দ্বীপ মানেই অন্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। কেমন যেন একটা স্বতন্ত্র ভাব। ডাক্তারের এ কথাটা কী ক্লান্ত মনের ভাব প্রকাশ করলো ? না, এর মধ্যে অন্য কিছু রয়েছে ?

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার ভাবলেন, তিনি এখানে হয়তো থেকে যাবেন। গুডবাই লণ্ডন। বিদায় হার্লে স্ট্রীট। সেই সঙ্গে কাজকেও টা টা করলেন। আঃ, কী শান্তি !

ডাক্তার দ্বীপ থেকে গুটি গুটি পায়ে এসে বাড়িতে প্রবেশ করলেন। তাঁর দৃষ্টি গেল একজন বয়স্ক ভদ্রলোকের দিকে। তিনি পাইপ টানছেন। তাঁকে তাঁর চেনা-চেনা মনে হচ্ছে, হ্যাঁ, তাঁকে তিনি চিনতে পেরেছেন। তিনি হলেন বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ্। একজন দক্ষ বিচারপতি। একবার তাঁর এজলাসে তাঁকে সাক্ষ্য দিতে হয়েছিল। তিনি জুরীদের বেশ স্বপক্ষে আনতে পারেন। আর বিচারে

দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁর করুণা লাভ করা অসম্ভব। তবে আড়ালে অনেকে তাঁকে নিষ্ঠুর বলে। কিন্তু এখানে এসে যে তাঁর দেখা পাবেন, তা তিনি আদৌ ভাবতে পারেননি।

৬

অপরদিকে বিচারপতি ওয়ারগ্রেভও একই কথা ভাবছেন, এই ডাক্তারকে কোথায় যেন দেখেছি। সাক্ষী দিতে এসেছিলেন ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই হবে। নামটা ? তাও মনে পড়েছে। আরমস্ট্রং। আর ডাক্তার মানেই বুদ্ধু। থাকে হার্লে স্ট্রীটে। ওখানে যত সব বোকাদের আড্ডা। তবু মুখে বললেন, ঐ দিকের হলঘরে গিয়ে বসুন।

ডাক্তার জানায়, তার আগে আমি একবার মিঃ এণ্ড মিসেস আওয়েনের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—তা তো সম্ভব নয়।

—কেন ?

—ওঁরা এখানে কেউ নেই। আজব জায়গার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

ডাক্তার মিনিট খানেক অপেক্ষা করলেন। জজ সাহেব আর কোন কথা বলছেন না। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন। একে বুড়ো হয়েছেন, তার উপর মেজাজটাও বোধ হয় ঠিক নেই। তিনি হল ঘরের দিকে এগিয়ে যান।

৭

অ্যাণ্টনি মার্সটন স্নান করছে। বেশ সুন্দর স্নান ঘরটা। এত দূর পাড়ি দিয়ে এসে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তবে পথের ক্লান্তি স্নানের পর আর থাকবে না। তারপর পাটভাঙা নতুন পোশাক, একটু সাজগোজ। এরপর এক কাপ গরম কফি। চমৎকার !

জায়গাটা যেন কেমন অদ্ভুত। একটা যেন অজানা রহস্য এখানে লুকিয়ে রয়েছে। তবে ওসব ভয়ের কোন ব্যাপারে মার্সটন একবারে

আমল দেয় না। আর 'ভয়' শব্দটা তার অভিধান থেকে একবারে মুছে ফেলেছে।

৮

ব্লোর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাইয়ের নটটা ঠিক মত বাঁধা হয়েছে কিনা দেখছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তারপর মাথায় চিরুনি বুলিয়ে প্যান্টের ভাঁজ দেখে নিলো। হ্যাঁ, সব ঠিক আছে। তবু আর একবার সে আয়নার দিকে তাকায়।

ব্লোর ভাবে, তার এমন সুন্দর পোশাক, তাকে দেখতে ভালো, তবু এরা তার সঙ্গে কথা বলছে না কেন! এরা যেন কেমন। আর এরা একে অন্যের দিকে যেন কেমন করে তাকাচ্ছে।

ব্লোর মনে পড়ে, ছোটবেলায় সে একবার এই দ্বীপে এসেছিল। তারপর ভাবতে পারেনি আবার তাকে এখানে আসতে হবে। সত্যি, মানুষ ভবিষ্যৎ দেখতে পায় না। পেলে কী হতো?

দূর! এসব কী ভাবছে! তারপর টাইয়ের নটটা ব্লোর আর একবার দেখে নেয়।

৯

ডিনারের ঘন্টাটা এক নাগারে বেজে চলেছে। ঘণ্টা শুনে ফিলিপ লম্বার্ড আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুত নিচে নেমে এল। ওর চলার মধ্যে যেন চিতা বাঘের ছাপ। কিন্তু কেন? তারপর আবার নিজেই নিজের মনে হাসছে।

মাত্র তো এক সপ্তাহের ব্যাপার, লম্বার্ড ভাবে। খাই দাই আর ফুর্তি করে কাটিয়ে দেবো।

১০

মিস গম্ভীরাননা নিজের একটা বড় আকারের বাইবেল নিয়ে পড়ছিলেন। ডিনারের ঘন্টায় বাইবেল রেখে উঠে দাঁড়ালেন। একটা

কথা তাঁর মনে পড়ে—পাপের শাস্তি মৃত্যু।

তাঁর পরনে কালো পোশাক, কিন্তু কেন? কোন কি শোকের কারণ ঘটেছে? আর না হলে পরতেই বা গেলেন কেন?

তাঁর ঠোঁট দুটো কাঁপছে। মুখ গম্ভীর। তারপর আস্তে আস্তে নিচে নামতে লাগলেন।

তিন

ডিনার বেশ ভালোই জমলো। রান্না, পরিবেশন সবই রজার্সরা চমৎকার ভাবে করেছে। ফলে অতিথিরা খুশী। একে অন্যের সঙ্গে গাল-গল্পে মেতেছে। একটু আগের গুমোট ভাবটা আর নেই। ওয়ারগ্রেভ কথা বলছেন। আইনের নানা বিচিত্র ও জটিল কাহিনী। তাঁর শ্রোতা ডাক্তার এবং মার্সটন।

ওদিকে ডগলাস এবং মিস গম্ভীরাননার মধ্যে বেশ আলাপ জমেছে। কথায় কথায় জানা গেল, উভয়ের কয়েকজন করে বন্ধু-বান্ধব আছে।

আর একদিকে ভেরা ক্লের্থন দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপারে নানা কথা জিজ্ঞেস করছে ডেভিসকে।

লম্বার্ডও সব শুনছে। তবে মাঝে মাঝে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

হঠাৎ মার্সটন বললো, এগুলো কী?

সবাই তার দিকে তাকালো, সত্যি তো!

—এ যে কতগুলো পুতুল দেখছি! ভেরা উচ্ছ্বসিত। আর কী সুন্দর পুতুলগুলো।

ডাইনিং টেবিলের দক্ষিণ কোণে একটা টেবিল। তাতে একটা কাচের স্ট্যাণ্ড। তার উপর সুন্দর করে রঙীন পুতুলগুলো সাজানো রয়েছে।

—কতগুলো পুতুল দেখি! ভেরা বলে। এক, দুই, তিন, চার...

এ যে দশটা দেখছি। জানেন, আমার শোবার ঘরে ছোটবেলার সেই ছড়াটা বাঁধানো আছে। সেই যে—দশটি দুষ্টু ছেলে ঘোরে পাড়াময়—।

—আরে! ও তো আমার ঘরেও আছে।

—আমারও!

—আমারও! সবাই যেন কোরাসে একই কথা জানালো।

—অদ্ভুত ব্যাপার! একজন বললো।

—এর মধ্যে অদ্ভুত কিছু নেই, ওভারগ্রেভ বলেন। এসব হলো গিয়ে বড়লোকদের সব এক একটা বিচিত্র খেয়ালের নমুনা।

—যা বলেছেন, গম্ভীরাননা এবং ডগলাস সায় জানায়।

ঘরে সবাই এখন চুপচাপ, হয়তো সবাই ভাবছে। শুধু ঘড়ির টিক-টিক শব্দ আর সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে। এবং বাইরে বারান্দা দিয়ে এখানে বাতাস প্রবেশ করছে।

—সমুদ্রের শব্দ আমার দারুণ ভালো লাগে, বললেন মিস গম্ভীরাননা অর্থাৎ এমিলি ব্রেনট।

—আমার উল্টোটা, ভেরা বলে ওঠে।

এই কথা বলতে সবাই ভেরার দিকে তাকায়। তাতে সে লজ্জা পেয়ে যায়। তারপর সে নিজের বক্তব্য পেশ করে। বলে, আমি ভেবেছিলাম, ঝড় উঠবে। উঠলে কী আমাদের ভালো লাগবে?

—তা ঠিকই, এমিলি বললেন। শীতকালটা কষ্টকর হবে। আর আমার মনে হয় না, বাড়ির কাজের জন্য লোক পাওয়া যাবে।

—আপনার ধারণাই ঠিক, ডাক্তার মাথা নেড়ে ওঁর কথায় সায় জানালেন।

—মিসেস ওলিভারের ভাগ্য ভালো যে, তিনি এমন দুটো কাজের লোক পেয়েছেন, এমিলি ঘাড় নেড়ে কথাটা স্বীকার করেন।

বয়স হলে মানুষরা লোকের নাম ওলটপালট করে ফেলে, মনে মনে বলে ওঠে ভেরা। মুখে বললো, এ ব্যাপারে ভাগ্য ভালো আওয়েনের।

—কী বললে তুমি? সোজা হয়ে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল এমিলি

ভেরার দিকে। মিসেস আওয়েনের ? ঐ নামে তো আমি কোনদিন কারুর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি বলে আদৌ মনে করতে পারছি না।

—কিন্তু আমি যতদূর জানি, ওঁদের ঐ নাম।

ওর কথা শেষ হবার আগেই কফির ট্রে নিয়ে রজার্স ঢুকলো। তখনকার মতন আওয়েন প্রসঙ্গ চাপা পড়লো। সবাই কফির পেয়ালায় মন দিল। তৈরি করেছেও চমৎকার।

জজ সাহেব আর এমিলি পাশাপাশি বসেছেন। অন্যমনস্কভাবে গোঁফে মোচড় দিচ্ছেন জেনারেল ডগলাস। ডাঃ আরমস্ট্রং তাকিয়ে আছেন সেই পুতুলগুলোর দিকে। আর লম্বার্ড একটা সচিত্র পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে।

ঘড়িতে ঢং করে রাত সাড়ে ন'টা ঘোষণা করলো। তারপরই ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দ, সমুদ্রের আওয়াজ এবং বাতাসের দাপাদাপি সহসা থেমে যায়। একটা ভয়ঙ্কর কিছু কী ঘটবে ? কে জানে ? আর অন্য সবাই বা চুপ করে গেছে কেন ? তারা কী কোন কিছু আশঙ্কা করছে ?

নিস্তব্ধতা খান খান করে ভেঙে গেল। একটা অজানা গম্ভীর কণ্ঠস্বরে সবাই সচকিত হয়ে ওঠে—

ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলাগণ,

শুনুন। আপনাদের সকলের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আছে। সেগুলো হলো—

(১) এডওয়ার্ড জর্জ আর্মস্ট্রং, ১৪ই মার্চ ১৯......আপনি লুইসা মেরি ক্লেসের মৃত্যুর কারণ ঘটিয়েছেন।

(২) এমিলি ক্যারোলাইন ব্রেন্‌ট, ৫ই নভেম্বর......বিয়াত্রিচে টেলর-এর মৃত্যুর জন্য দায়ী আপনি।

(৩) উইলিয়াম হেনরি ব্লোর, ১০ই অক্টোবর......আপনি জেমস স্টিফেন ল্যান্‌ডর-এর মৃত্যু ঘটিয়েছেন।

(৪) ভেরা এলিজাবেথ ক্লেথর্ন, ১১ই আগস্ট......আপনি সিসিল অগিল্‌ভি হ্যামিলটনকে হত্যা করেছেন।

(৫) ফিলিপ লম্বার্ড,......ফেব্রুয়ারী, আপনি পূর্ব আফ্রিকার একুশজন লোকের মৃত্যুর জন্য দায়ী।

(৬) জন গর্ডন ডগলাস, ৪ঠা জানুয়ারী......আপনি আপনার স্ত্রীর প্রণয়ী রিচমণ্ডকে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়েছেন।

(৭) অ্যান্টনি জেমস মার্সটন, ১৩ই নভেম্বর......আপনি জন ও লুসি কোম্বের হত্যার অপরাধে আভযুক্ত।

(৮) ও (৯) টমাস রজার্স এবং এথেল রজার্স, ৬ই মে...... তোমরা জেনিফার ব্র্যাডির মৃত্যুর কারণ।

এবং (১০) লরেন্স জন ওয়ারগ্রেভ, ১০ই জুন......আপনি এডওয়ার্ড সেটনকে হত্যার অপরাধে দোষী।

অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ, আপনাদের আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন বক্তব্য আছে কী ?

২

হঠাৎই যেমন কথাগুলো শোনা গেছিল, তেমনি হঠাৎ আবার কথাগুলো থেমে যায়। তারপরই ঝনঝন একটা শব্দ। রজার্স থরথর করে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে। এবং অন্যদিকে ঘরের বাইরে একটা আর্তনাদ শোনা যায়, সেই সঙ্গে কিছু একটা পড়ে যাবার শব্দ।

লম্বার্ড দৌড়ে বাইরে এলো। দেখলো অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছে রজার্সের স্ত্রী এথেল।

—মার্সটন ! তাড়াতাড়ি এদিকে এসো, লম্বার্ড ডাকলো। ওরা দু'জনে ধরাধরি করে একটা সোফায় এথেলকে শুইয়ে দিল। তারপর ডাঃ আর্মস্ট্রং ওকে পরীক্ষা করে বললেন, ভয়ের কিছু নেই। অজ্ঞান হয়ে গেছে। একটু পরেই ঠিক হয়ে যাবে।

এরপর লম্বার্ড রজার্সকে বললো, একটু ব্র্যাণ্ডি নিয়ে এসো। রজার্স কোন রকমে কাঁপতে কাঁপতে বললো, নিয়ে আসছি। বলে সে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়।

—কিন্তু ঐভাবে কে কথা বললো ? ভেরা এখনো চিন্তিতভাবে

কথাটা বললো। আর সে গেলোই বা কোথায় ?

—ঠাট্টা করেছে কেউ, ডগলাস বললেন। কিন্তু কী বিশ্রী ধরনের ঠাট্টা। জোর গলায় বলতে চাইলেও তাঁর গলা কাঁপছে। আর মুখ দেখে মনে হয়, এ মুহূর্তে তাঁর বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে।

ব্লোর হাতে ধরা রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো, কিন্তু গরম কোথায় ? ভয়ে কী তার এই অবস্থা ? অন্যদেরও তাই। শুধু কিছুটা অবিচলিত রয়েছেন ওয়ারগ্রেভ এবং এমিলি। তবুও ওয়ারগ্রেভ ঘরের চারদিকে তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি বোলাচ্ছেন।

এদিকে সাহসের পরিচয় দেয় লম্বার্ড। সে ঘর থেকে একাই বেরিয়ে যেতে যেতে বললো, ওর দেখা পেলে ছেড়ে কথা বলবো না।

প্রথমে সে বারান্দাটা তন্নতন্ন করে খুঁজলো। না, তেমন সন্দেহ করার মতন সে কিছুই পেলো না। ওদিকে একটা ঘরের কাছে এলো। ঘরটা বন্ধ। তারপর কি মনে করে একটানে সে দরজাটা খুলে ফেলে ভেতরে প্রবেশ করে। আর তখনই রহস্যটা বেরিয়ে পড়লো।

—তাহলে এই ব্যাপারে! আবিষ্কারের আনন্দে মাতল লম্বার্ড। একমাত্র এমিলি ছাড়া সেখানে সকলে ছুটে যায়। তিনি তাঁর নিজের জায়গায় বসে রইলেন। একটা টেবিল। তার উপর চোঙা-ওয়ালা পুরনো একটা গ্রামোফোন। তাতে একটা রেকর্ড চাপানো আছে। চোঙাটার মুখ দেয়ালের দিকে। এই ঘর আর ড্রইংরুমের দেয়ালের মধ্যে বেশ কয়েকটা ফুটো রয়েছে। ব্যাপারটা এবার সকলে বুঝতে পারলো। পিনটা রেকর্ডের উপর রেখে চালাতেই সেই আগের কথাগুলো বেজে উঠলো।

—বন্ধ করুন! বন্ধ করুন! ভেরা বলে ওঠে। কী সাংঘাতিক। লম্বার্ড সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেয়।

ডাক্তার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, এটা একটা নিছক মজা ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে বিকৃত রুচির পরিচয়।

—তা নয় হলো, মার্সটন বলে। কিন্তু চালালো কে ?

—ঠিক কথা, ওয়ারগ্রেভ ওর কথায় সমর্থন জানান।

ওদিক রজার্স ব্র্যাণ্ডি নিয়ে ফিরে এসেছে। তার স্ত্রীকে সেবা করছেন এমিলি।

ইতিমধ্যে সবাই ড্রইংরুমে ফিরে এসেছে।

রজার্স তার স্ত্রীর কাছে মুখ নিয়ে ডাকে। এথেল, তুমি কেমন আছো ? ভয় পাবার কি আছে! আমরা তো সবাই আছি।

এথেল একবাব চোখ খুলে তাকাল। দু'চোখে তার স্পষ্ট ভয়ের চিহ্ন। তবু সকলের মুখের দিকে একবার সে তাকায়।

—এথেল, নিজের উপর বিশ্বাস রাখো, রজার্স বলে। এই সামান্য ব্যাপারে ভয় পাবার কী আছে!

ডাক্তার এথেলকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লেন, তোমার কিছু হয়নি। তুমি এখুনি সুস্থ হয়ে উঠবে।

—আমি—আমি অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম! এথেল কাঁপা গলায় ডাক্তারের দিকে তাকায়।

—হ্যাঁ।

—কী ভয়ঙ্কর সেই স্বরটা..., বলে এথেল এলিয়ে পড়ে।

ব্র্যাণ্ডি! তাড়াতাড়ি, ডাক্তার কোন রকমে একটু ব্র্যাণ্ডি এথেলের গলায় ঢেলে দেন। তারপর সে সুস্থ হয়।

—ঠিক হয়েছি আমি ? এথেলের জিজ্ঞাস্য। আমার যেন মাথাটা কেমন করে ঘুরে গেছিল।

—আমারও, রজার্স স্ত্রীর দিকে। তখন আমারও হাত থেকে ট্রেটা পড়ে যায়। আর তুমি বলো, কী সাংঘাতিক সব মিথ্যে কথা!

—কিন্তু রেকর্ডটা কে চালালো ? ওয়ারগ্রেভ রজার্সের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকান। তুমি রজার্স ?

একটা ঝাড়ন দিয়ে রজার্স নিজের মুখ মুছে কিছুটা স্বাভাবিক হতে চাইলো। তারপর কাঁপা গলায় বললো, আমি একজনের হুকুম তামিল করেছি।

—হুকুম ? কিন্তু কার ?

—মিঃ আওয়েনের।

—ঠিক করে বলো, তিনি তোমায় কী আদেশ করেছেন ?

—বলেছেন, গ্রামাফোনে রেকর্ডটা বসিয়ে চালিয়ে দিতে। রেকর্ডটা থাকবে ড্রয়ারে। আর চালাতে বলেছেন, যখন আপনারা কফি পান করবেন। এবং এ কাজের ভার দিয়েছিলেন আমার স্ত্রীকে।

—বাঃ, চমৎকার গল্প !

—গল্প নয়। সব সত্যি। আমি ভেবেছিলাম, ওটা একটা গানের রেকর্ড। ওটায় একটা কি যেন নামও লেখা আছে।

—লেখা আছে ? দেখুন তো মিঃ লম্বার্ড, ওর কথা ঠিক কী না ! ওয়ারগ্রেভ ওকে অনুরোধ জানান।

—হ্যাঁ, আছে বলেই তো মনে হচ্ছে, বলে ও আলোতে রেকর্ড-খানা তুলে ধরে।

—কী লেখা আছে ? সকলে যেন এক সঙ্গে কথা বলে উঠলো।

—বেলা শেষের গান।

৩

—একবারে ডাহা মিথ্যে, ডগলাস বললেন। লোকটাকে শাস্তি দেবার জন্য কিছু একটা করা দরকার। কি নাম যেন ওর। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আওয়েন। ওকে উচিত শিক্ষা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এবার এমিলির জিজ্ঞাস্য, কিন্তু এই আওয়েন লোকটা কে ?

—সেই কথা আমাদের জানতে হবে। তার জন্য কিন্তু আলোচনার প্রয়োজন। বলে ওয়ারগ্রেভ রজার্সের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে শুইয়ে দিয়ে এসো। তোমার সঙ্গে কিছু কাজের কথা রয়েছে।

—আসছি আমি।

—দাঁড়াও, আমি তোমায় সাহায্য করছি, ডাক্তার বললেন। তারপর ওদের দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে এথেল আস্তে আস্তে চলে যায়।

—একটু কফির ব্যবস্থা করলে মন্দ হয় না, মার্সটন বললো। তখন তো কফিটা খাওয়াই গেল না।

—কিন্তু রজার্স তো এখন,... ভেরা অসুবিধের কথাটা বললো।

—কফি আমি করে আনছি, মার্সটন বলে। রজার্সের চেয়ে বোধহয় খারাপ করবো না।

—চলো, আমি তোমায় সাহায্য করি, লম্বার্ড বলে ওঠে।

কয়েক মিনিট পরে ওরা বেশ কয়েক কাপ কফি নিয়ে ফিরে এলো এবং তা পরিবেশনের ভার নেয় ভেরা।

ইতিমধ্যে ডাক্তার ফিরে এসেছেন, দেখছি, কফি তৈরি করে ফেলেছেন। আমাকেও এক কাপ দেবেন। আর এথেল ভালো আছে। চিন্তার কোন কারণ নেই। ওকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে এসেছি।

এর একটু পরে রজার্স ঘরে ঢুকলো। সারা মুখে ওর একটা অস্বস্তিজনিত ভয়ের ভাব। ও যেন আসামী।

বয়স এবং পদমর্যাদায় সম্ভবত প্রধান মিঃ ওয়ারগ্রেভ। তিনি যেন সভা পরিচালনার ভার নিলেন।

তিনি বললেন, আমাদের এই রহস্যের কিনারা করতে হবে। বলে তিনি সকলের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রজার্সের দিকে তাকান। রজার্স, এই আওয়েন কে?

—পান্না দ্বীপের মালিক।

—তা আমরা জানি। তুমি কি জান তাই বলো।

—আমি কিছুই জানি না।

—জানো না?

—না স্যার, আর আমি তাঁকে দেখিওনি।

—দেখনি মানে?

—এখানে আমি এবং আমার স্ত্রী এক সপ্তাহ হল এসেছি। খবরের কাগজে বক্স নাম্বার দেখে চাকরির দরখাস্ত করেছি এবং একটা চিঠির মাধ্যমে আমাদের চাকরি দেওয়া হয়েছে।

—সেই নিয়োগপত্রটা তোমার কাছে আছে ?

—মানে...... ।

—আমতা আমতা করো না ! ডগলাসের কড়া গলা । এবং দু'চোখে তাঁর একটা সন্দেহ ছায়া ঘনিয়ে ওঠে ।

—মানে যে চিঠিটা আমাদের দেওয়া হয়েছিল ?

—হ্যাঁ ।

—সেটা নেই স্যার ।

—নেই ? আচ্ছা ঠিক আছে । তারপর ?

—সেই চিঠি পেয়ে তো আমরা এখানে এসে সব ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করলাম । তারপর চিঠিতে হুকুম এলো, অথিতিরা আসবেন । তাঁদের যেন কোন রকম অসুবিধে না হয় । আবার গতকাল বিকেলে একটা চিঠি পেলাম । তাতে লেখা ছিল, ওঁনারা আসতে পারছেন না । ডিনার, কফি এবং রেকর্ড সম্পর্কেও তাতে নির্দেশ ছিল ।

—সেই চিঠি তুমি নিশ্চয়ই তোমার কাছে রেখে দিয়েছো ।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, রজার্স পকেট থেকে খামটা বার করে । এতে চিঠিটা আছে । বলে সে জজ সাহেবের দিকে ওটা বাড়িয়ে দেয় ।

তিনি হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে সেদিকে তাকান । চিঠিটা টাইপ করা । এবং তাতে ঠিকানা লেখা রয়েছে—রিৎস হোটেল ।

—চিঠিটা একটু দেখতে দেবেন ? জজের কাছে ব্লোর এসে দাঁড়ায় । তারপর চিঠিটা দেখে বলে, করোনেশন টাইপরাইটারে ছাপা । তবে কাগজটা সাধারণ । না, তেমন কোন বিশেষত্ব নেই ।

—আমার মনে হয় আমরা এখানে কেন উপস্থিত হয়েছি, তা সকলকে জানানো দরকার, ওয়ারগ্রেভ এবার অন্য প্রসঙ্গে এলেন । এটা ঠিক আমরা সকলে আওয়েনের অতিথি । তিনি কে এ প্রসঙ্গে আলোচনা খুবই প্রয়োজন । তাঁর ব্যাপারে কে কতটুকু জানেন তা জানা এখন একান্তভাবে দরকার ।

—আমি প্রথমে বলতে চাই, এমিলি বললেন । আমার কিন্তু ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে বলে মনে হচ্ছে । আমি আমার এক

বান্ধবীর কাছ থেকে চিঠিটা পাই। চিঠির তলায় নামটা ছিল অস্পষ্ট। পড়তে বেশ অসুবিধে হয়। প্রথমটা ভেবেছিলাম, ওলিভার বা ঐ জাতীয় কিছু। তবে আওয়েন বলে আমি কাউকে চিনি না।

—চিঠিটা কি আপনার কাছে আছে?

—আছে। এক মিনিট। তিনি উপর থেকে চিঠিটা এনে ওঁর হাতে দেন।

—ভেরা, এবার তোমার কথা বলো, ওয়ারগ্রেভ ওর দিকে তাকান।

ভেরা জানায়, কি ভাবে সে এখানে সেক্রেটারির কাজটা পেয়েছে।

—এবার মার্সটন।

—বার্কলি আমার এক বন্ধু। তার চিঠিতে এখানকার চাকরির ব্যাপারটা জানতে পারি। কিন্তু একটা জিনিস অদ্ভুত। আমার এই বন্ধু এখন থাকে নরওয়েতে।

—ডাক্তার?

—আমার পেশার ব্যাপারেই আমি কল পেয়েছি।

—আওয়েনদের চিনতেন না?

—না।

লম্বার্ড এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ব্লোরের দিকে। হঠাৎ সে বলে উঠলো, আমার একটা কথা বলার আছে।

—অপেক্ষা করুন। একে একে সবাই বলবেন। তাকে বাধা দিলেন ওয়ারগ্রেভ। তাছাড়া, আমরা জানতে চাইছি কেন এখানে সকলে এসেছি।

তারপর তিনি জেনারেলের দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, জেনারেল ডগলাস, এবার আপনি বলুন।

—আমি আওয়েনের কাছ থেকে একটা চিঠি পাই। তাতে লেখা ছিল—এখানে এলে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন।

—এবার মিঃ লম্বার্ড, বলুন আপনি কি বলতে চান।

লম্বার্ড একটু ভাবলো, সত্যি বলবো, না অন্য কিছু। তারপর সে বলে, আপনার কয়েকজন বন্ধু আসছেন। আপনিও আসতে পারেন।

—সে চিঠিটা ?

—আমি সঙ্গে রাখিনি।

একটু চুপ করে থেকে ওয়ারগ্রেভ ব্লোরের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, আমি এইমাত্র একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম। একটা দেহহীন কণ্ঠস্বর আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে। সত্যি কি মিথ্যে সেটা যাচাইয়ের প্রশ্ন। কিন্তু একজনের বিরুদ্ধে সেই দোষারোপ নেই। সেই একজন হলেন উইলিয়াম হেনরি ব্লোর। এই নাম কিন্তু আমাদের মধ্যে কারুর নেই। আছেন মিঃ ডেভিস বলে একজন। এই অপরাধের তালিকায় এর কোন নাম নেই।

ব্লোর এ কথা রুক্ষ স্বরে প্রতিবাদ করে বললো, আমার নাম ডেভিস নয়।

—আপনি তাহলে উইলিয়াম হেনরি ব্লোর ?

—হ্যাঁ !

—আমি এর সঙ্গে আরো কিছু যোগ করতে চাই, লম্বার্ড বললো। তারপর সে ব্লোর দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় জানায়, তুমি আগে বলেছিলে, দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যাটাল থেকে এসেছো। আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ন্যাটাল বা দক্ষিণ আফ্রিকায় আদৌ জীবনে যাওনি।

এখন সকলের দৃষ্টি ব্লোরের দিকে। সে চাহনিতে একটা ক্রুদ্ধ ভাব। মার্সটন তো ওর দিকে ঘুঁষি পাকিয়ে এগিয়ে গেল।

—তাহলে শুনুন আপনারা, ব্লোর সবার দিকে তাকায়। আমি আমার পরিচয়পত্র সঙ্গেই এনেছি। আমি আগে সি. আই. ডি-তে ছিলাম। এখন আমি প্রাইভেট গোয়েন্দা। আমার অফিসও আছে। আর এখানে সেই কাজ নিয়েই এসেছি।

—কে আপনাকে আসতে বলেছে ?

—মিঃ আওয়েন। সঙ্গে মোটা টাকার মনি-অর্ডার পাঠিয়েছেন

এবং অনুরোধ করেছেন, আমি যেন আপনাদের উপর নজর রাখি।

—নজর রাখবেন ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু কেন ?

—কেন আবার, যাতে মিসেস আওয়েনের মূল্যবান গহনাগাঁটি না চুরি যায়, বলেই ব্লোর বলে। গহনা না ছাই। এ নামে এখানে কেউই নেই। আর আমি আপনাদের নামের একটা তালিকা আগেই পেয়েছি।

—আর লোকটা যদি থাকেও তাহলেও একটা আস্ত পাগল, ভেরা ওদের মাঝে কথা বলে।

—পাগল ? হতে পারে। গম্ভীর গলায় বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ বললেন। কিন্তু এ এমন পাগল যাকে ভয় করার যথেষ্ট কারণ আছে। তাই নয় কী ?

চার

কয়েকটি মানুষ নিঃশব্দে বসে আছে। কারুর মুখে কোন কথা নেই। ওদের মধ্যে যেন একটা হতাশার ভাব ফুটে উঠেছে।

এবার বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি নিজে কেন এখানে এসেছি তা প্রথমে বলি। তারপর তিনি পকেট থেকে একটা খাম বার করে টেবিলে রাখলেন। তার মধ্যে থেকে চিঠিটা তুলে নিলেন। আমি এই চিঠি কয়েকদিন আগে পাই। লিখেছেন লেডী কন্‌স্টান্স কালমিংটন। আমার বিশেষ পরিচিতা। তবে তাঁর সঙ্গে আমার বেশ কয়েক বছর যোগাযোগ নেই। শুনেছিলাম, তিনি নাকি বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। এই চিঠিটা তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই রকম চিঠি আমরা প্রত্যেকে পেয়েছি। এই চিঠি ভুয়ো বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবে যে বা যারা এই চিঠি

পাঠিয়েছে, তারা কিন্তু আমাদের ব্যাপারে অনেক খবরা-খবর যোগাড় করেছে। আমার নিজের কথাই ধরুন না। আমাকে যে চিঠি লিখেছে। তার সঙ্গে লেডী কন্‌স্টান্সের দারুণ পরিচয় না থাকলে এ ধরনের চিঠি লেখা কখনো সম্ভব নয়। কারণ হাতের লেখার দারুণ মিল। এইভাবে আমরা সবাই চিঠি পেয়েছি। এতেই বোঝা যাচ্ছে, চিঠি-প্রেরক অনেক খবর রেখেই তবে এ কাজটা করেছে।

তিনি একটু থেমে আবার বললেন, সে আমাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। তাই অপরাধগুলো আমাদের সবার ঘাড়ে একে একে চাপিয়েছে।

—না, না, এসব মিথ্যে কথা, প্রতিবাদের ঝড় উঠলো। যিনি প্রথমে গর্জে উঠলেন তিনি হলেন জেনারেল।

—একটা বাজে লোকের এসব কাজ! ভেরা চিৎকার করে বলে, একটা অসভ্য বদমাশ লোক!

—মিথ্যে কথা! চেঁচিয়ে ওঠে রজার্সও। আমরা কেউ কোন অপরাধ করিনি।

—ও চায় কী? আর ওর মতলবই বা কী? অ্যান্টনি জোর গলায় চেঁচিয়ে কথাটা বলে।

মিঃ ওয়ারগ্রেভ একটা হাত তুলে সকলকে থামতে অনুরোধ করলেন। তারপর সবাই একটু শান্ত হতে তিনি একটু ভেবেচিন্তে বললেন, আমি প্রথমে নিজের কথা বলি, তাহলে বুঝতে পারবেন আমি কি বলতে চেয়েছি।

একটু দম নিয়ে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, আমার এই অজানা বন্ধুটি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন যে, আমি নাকি জনৈক এডওয়ার্ড সেটনকে......। এবার আমি ঘটনাটা বলি। ১৯...এর জুন মাসে আমার এজলাসে তার বিচার হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, বয়স্কা এক নারীকে হত্যা করার। দারুণ ভাবে সে তার আত্মপক্ষ সমর্থন করে। তার বিবৃতি জুরিদের মনেও বেশ প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে যে প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাতে

সে যথেষ্ট অপরাধ করেছে। আমি চুল-চেরা বিচার করে তাকে মৃত্যুদণ্ড দি। সে আপীল করে। সে আপীল খারিজ হয়ে যায়। তারপর যথা সময়ে তার মৃত্যুদণ্ড হয়।

তিনি সবার দিকে তাকিয়ে আবার বলেন, আপনারা বলুন এতে আমার অপরাধ কোথায় ? আমি ইচ্ছাকৃত ভাবে কিছুই করিনি। যা করেছি আইনের সাহায্যে। ফলে আমি বিবেকের কাছেও দায়মুক্ত। তাহলে আমার অপরাধ কোথায়! আমি বিচারকের আসনে বসে পবিত্র কর্তব্য পালন করেছি মাত্র।

এই সেটন মামলার কথা আর্মষ্ট্রংয়ের মনে পড়ে। সবাই ভেবেছিল, রায়টা উল্টো হবে। তাঁর এক অ্যাডভোকেট বন্ধু ম্যাথুজ তাঁকে এই মামলার কথাটা বলেছিলেন। রেস্তোরাঁয় বসে দু' বন্ধুতে কথা হচ্ছিল। তখন ম্যাথুজ বলেছেন, দেখো আসামী বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে। কিন্তু তা হলো না। পরে বিস্মিত হয়েছেন ম্যাথুজ। তাঁর ক্ষোভ আজও ডাক্তারের মনে আছে। তিনি বলেছেন, আসামীর উপর জজের কোন গোপন রাগ ছিল। সেটা আজ তিনি সুদে আসলে তুলে নিলেন। লোকটাকে ফাঁসির দড়িকাঠে না ঝুলিয়ে যেন ওঁ স্বস্তি পাচ্ছিল না। তবে বুড়োকে কিছু বলা যাবে না। আইন রপ্ত করেছে ভালো।

ডাক্তারের এই সব কথাগুলো মনে পড়ে। তিনি আর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। বললেন, আপনি কি মামলার আগে থাকতে সেটনকে চিনতেন ?

এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ওয়ারগ্রেভের মুখ চোখ রাগে লাল হয়ে ওঠে। তবু নিজেকে শান্ত এবং সংযত করে বললেন, মামলার আগে ওকে চেনা তো দূরের কথা, ওর নাম পর্যন্ত শুনিনি। সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন।

আর্মষ্ট্রং মনে মনে বলে উঠলেন, জজ সাহেব, তুমি মিথ্যে বলছো। একবারে মিথ্যে।

২

এবার ভেরার পালা। সে কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, একটি শিশুর কথা আপনাদের বলছি। তার ডাক নাম সিরিল। আমি তার গভর্নেস ছিলাম। ওর সারাদিনের শিক্ষিকা এবং বন্ধু দুই আমি। ও আমাকে খুব ভালোবাসতো। আর আমিও তাকে, বলতে বলতে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে ভেরা আবার বলে, কী সুন্দর আর চঞ্চল ছিল সে। এই চঞ্চলতাই ওর কাল হলো। ওকে তখন আমি সাঁতার শেখাচ্ছিলাম। একলা জলে নামতে দিতাম না। এবং দূরেও নয়। একদিন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। তখন জলে আমি নামিনি। সেই ফাঁকে দুষ্টুটা গিয়ে জলে নেমে পড়লো। টের পেতেই আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে জল থেকে তুলতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমার তো কোন দোষ ছিল না।

ভেরা হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছে ধরা গলায় ফের বলে, তদন্তে আমি নির্দোষ প্রমাণিত হই। ওদের পরিবারের সকলে আমায় দারুণ ভালোবাসতো। বিশেষ করে বাচ্চাটির মা। ওরা আমার প্রতি খুব করুণা দেখিয়েছিল যাতে বিচারে আমার কোন সাজা না হয়।

ভেরা এবার নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, কিন্তু আজ আমার দোষারোপ করা হচ্ছে কেন? এর মানে কী? এসব তো আদৌ ভালো কথা নয়।

কথা শেষ করে ভেরা নিজেকে আর সামলাতে পারে না। ঝর-ঝর করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বাচ্চা মেয়েদের মত কাঁদতে থাকে।

—তুমি কেঁদো না, জেনারেল ডগলাস ভেরাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন। তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা কেউ বিশ্বাস করছে না। সব মিথ্যে। আসলে এটা একটা পাগলের কাণ্ড।

তারপর ডগলাস সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বুক টান করে বললেন,

এইসব আজেবাজে অভিযোগ সম্বন্ধে চুপ করে থাকাই শ্রেয়। তবে আর্থার রিচমণ্ডের সঙ্গে আমার ও আমার স্ত্রীর নাম জুড়ে যে সব বলা হয়েছে, তা সব মিথ্যে। রিচমণ্ড ছিল আমার বাহিনীর একজন নতুন অফিসার। যুদ্ধক্ষেত্রে তার মৃত্যু হয়, যা অনেকেরই হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মৃত্যু। আর লড়াইতে তো ঐ সব হতেই পারে। এবং হয়েছিলও তাই। আর আমার স্ত্রী ছিল সতীসাধ্বী।

হঠাৎ জেনারেল বসে পড়লেন। একটা হাত দিয়ে নিজের চিবুকটা ধরে রয়েছেন। হাতটা তাঁর ঈষৎ কাঁপছে। মনে হয়, এই মাত্র দৃঢ়কণ্ঠে যা বললেন তা বলতে গিয়ে প্রচণ্ড মানসিক শক্তি ব্যয় করতে হয়েছে। ভেতরে যেন গভীর ক্লান্তি ও অবসাদ।

এইবার লম্বার্ড কথা বললো। তার দু'চোখে কৌতুক। সে বলে, ও যে কালা আদমীগুলোর কথা বলা হয়েছে আমার বিরুদ্ধে, তা...।

—তা কী? মার্সটনের জিজ্ঞাসা।

—সম্পূর্ণ সত্যি, হাসলো লম্বার্ড। দলে আমরা তিনজন ইংরেজ ছিলাম। খাবার ফুরিয়ে এসেছিল। আবার আর এক বিপদ। বনের মধ্যে পথও হারিয়ে বসেছিলাম। সবার কাছে নিজের প্রাণ সব থেকে বড়। ফলে আমরা তিনজন ওদের ফেলে চম্পট দিয়েছিলাম।

—তোমরা দলের লোকদের ফেলে পালালে? ডগলাস ওকে ধিক্কার দিলেন। ভীরু, কাপুরুষের দল কোথাকার! নিজেদের প্রাণটাই সব চেয়ে বড় হলো! ওরা মানুষ নয়!

—এখন বুঝতে পারছি, পাকা ইংরেজের মত কাজটা হয়নি, লম্বার্ড হাসলো। আসলে শাস্ত্রের কথা মেনে চলেছি। নিজে বাঁচলে বাপের নাম। আশা করি আমার তখনকার মনের অবস্থা আপনারা বুঝতে পারছেন। আর তিনজন শ্বেতাঙ্গের চেয়ে কুড়িটা জংলীর দাম কী বেশী।

—ওদের মরণের মুখে রেখে পালাতে পারলেন? ভেরা বিস্ময় প্রকাশ করলো। আপনার বিবেক আপনাকে বাধা দিল না?

—না, দিল না, লম্বার্ডের সাফ জবাব।

—এবার আমি ভাবছি নিজের কথা, বললো অ্যান্টনি মার্সটন। জন এবং লুসি কোম্বের হত্যার অপরাধে আমি নাকি অপরাধী। কিন্তু উপস্থিত সকলের কাছে আমার একটা প্রশ্ন, তারা কারা ? ও হ্যাঁ, এখন মনে পড়েছে। কেম্ব্রিজের কাজে এক জোড়া বাচ্চা আমার গাড়ির তলায় চাপা পড়েছিল। পোড়া কপাল আর কী!

—পোড়া কপাল কার ? ওয়ারগ্রেভ টিপ্পুনি কাটেন। তোমার না তাদের ?

—নিজের কথা আমি বলছি। তবে আপনিও ভুল বলছেন না। ভাগ্য তাদের মন্দ বলতে হবে বই কি। এটা একটা দুর্ঘটনাই বলা চলে। ওরা কাছের একটা বাড়ি থেকে দৌড়ে আমার গাড়ির তলায় এসে পড়েছিল। একটা মর্মান্তিক ঘটনা।

—তোমরা, মানে আজকালকার ছেলেরা বড় বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চালাও, ডাক্তার বললেন। আর না হলে নাকি তোমাদের গাড়ি চালিয়ে সুখ হয় না। কিন্তু এটা উচিত নয়।

—কিন্তু দোষ কিসে বলুন! যুগের যা হাওয়া। আর ইংল্যাণ্ডের রাস্তায় কী জোরে গাড়ি চালানো যায়! তবে যাই হোক্, ঐ ঘটনার জন্য আমি আদৌ দায়ী ছিলাম না।

৩

—আমি বলছিলাম..., রজার্স গলা পরিষ্কার করে বলে।

—বলো কি বলছিলে ? লম্বার্ড প্রশ্ন করলো।

—স্যার, আমাকে ও আমার স্ত্রীকে জড়িয়ে মিসেস ব্র্যাডি সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ...

—তা কী ?

—একবারে ডাহা মিথ্যে।

—বলে যাও।

—তাঁর শরীর ভালো ছিল না। বিয়ে-থাও কোনদিন করেননি। আমরা দু'জনে মিলে তাঁর দেখাশোনা, সেবা-যত্ন সবই করতাম। তিনিও আমাদের খুব ভালোবাসতেন। একদিন তাঁর শরীরটা খারাপ হলো। রাতে আবার বেশী বাড়াবাড়ি। সেই সঙ্গে আবার প্রবল ঝড় বৃষ্টি। পায়ে হেঁটে ডাক্তারের বাড়ি গেলাম। তিনি এলেন। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। তিনি হার্টফেল করে মারা গেছেন।

রজার্স ভেজা গলায় আবার বলে, আমরা শেষ পর্যন্ত তাঁর সেবা করেছি। কর্তব্যে এতটুকু অবহেলা ছিল না। কেউ কোনদিন আমাদের দোষারোপ করতে পারেননি। আর শেষে কী না আমাদের নামেই......।

লম্বার্ড স্থির দৃষ্টিতে রজার্সের দিকে তাকিয়ে রইলো। কিছু জিজ্ঞেস করলো না।

প্রশ্ন করলো ব্লোর। বললো, যাক্, তিনি তো গেলেন। সেই সঙ্গে তোমাদের কী পথে বসিয়ে গেলেন? না, তোমাদের পকেটে কিছু এসেছে?

—তাঁকে সেবা করার পুরস্কার তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন, রজার্স জানায়। আর কেনই বা দেবেন না!

—মিঃ ব্লোর, এবার নিজের কথা কিছু বলুন, লম্বার্ড ব্লোরের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলে।

—আমার আবার কী কথা! ব্লোর যেন ধপাস করে এইমাত্র আকাশ থেকে পড়লো।

—কেন, আপনার নামও সেই তালিকার মধ্যে আছে।

—ও, সেই ল্যাণ্ডরের কথা বলেছেন? সেই ব্যাঙ্ক লুটেরা আসামী?

একথা শুনে ওয়ারগ্রেভ একটু নড়ে চড়ে বসলেন। বললেন, মামলাটা অবশ্য আমার এজলাসে ওঠেনি। তবে ঐ মামলার কথা আমার বেশ মনে আছে। আপনার এজাহারের উপর ভিত্তি করে

ল্যাণ্ডরের শাস্তি হয়, তাই না ? পুলিশের তরফ থেকে আপনিই মকদ্দমার তদারক করছিলেন। ল্যাণ্ডরের কারাদণ্ড হয়। তার স্বাস্থ্য ভালো ছিল না। কয়েক বছর পরে জেল হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।

—জালিয়াত লোকটা রাতের পাহারাদারকে কাবু করে কাজ হাসিল করেছিল, ব্লোর বললো। তার অপরাধ স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

—আর দক্ষতার সঙ্গে মামলা পরিচালনা করার জন্য আপনি কোন পুরস্কার পাননি ?

—আমার পদোন্নতি হয়েছিল, ব্লোর জানায়। আসলে আমি তো আমার কর্তব্য সঠিক ভাবে পালন করেছিলাম।

—সত্যি, কী কর্তব্যপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ ! অবশ্য আমি বাদ।

ওয়ারগ্রেভ এবার ডাঃ আর্মস্ট্রংকে তাঁর বক্তব্য পেশ করতে বললেন। তা শুনে ডাক্তার বলেন, কী বলবো বলুন তো ! যাক্, আপনারা যখন শুনতে চেয়েছেন। ওর নামটা যেন কি ছিল ! ক্লিসঃ? না ক্লোজ ? সত্যি কথা বলতে কি, ঐ রোগীর নাম আমার মনে নেই। কিংবা মনে পড়ে না আমি কোন মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছে। অনেক দিন আগের কথা। হয়তো হাসপাতালে কোন অপরারেশন কেস। ওরা অনেকেই আসে দেরিতে আর এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। তাতে দোষ হয় ডাক্তারের।

তারপর মনে মনে ভাবলেন ডাক্তার, হ্যাঁ, আমি মদ পান করেছিলাম। নেশা হয়েছিল। হাত কাঁপছিল। সেই অবস্থায় তাকে অপারেশন করি। হ্যাঁ, তাকে আমিই মেরে ফেলি। আহা কতই বা মহিলাটির বয়স হয়েছিল ! সামান্য আপারেশন। তবু গোলমাল করে ফেলি। কিন্তু কেউ জানে না। শুধু একজন ছাড়া। সে হলো সিনিয়ার নার্স। সে কাউকে বলেনি। কিন্তু এতদিন পরে কে সে কথা জানলো, সেটাই দারুণ এক আশ্চর্যের কথা।

এবার সকলে প্রস্তুত হলো এমিলি ব্রেন্টের বক্তব্য শোনবার জন্য। সকলের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, আপনারা কী আমার কাছে কিছু শুনবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন ? তাহলে কিন্তু নিরাশ হবেন। আমার কিছুই বলার নেই।

—কিছু নেই ? জজের প্রশ্ন।

—না।

—আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চান না ?

—তার তো কোন প্রশ্নই এক্ষেত্র উঠছে না, আর চিরদিন আমি আমার বিবেক দ্বারা পরিচালিত হই। সে বিবেকের নির্দেশ শুভ। আজও এ ভাবে চলছি।

একটা অস্বস্তির আবহাওয়া ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু অনড় রইলেন এমিলি।

—যাক্, আমার তদন্ত শেষ হলো, বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ গলাটা একটু কেশে পরিষ্কার করে বললেন। তারপর তিনি রজাসে'র দিকে তাকিয়ে বললেন, আচ্ছা রজাস' ?

—বলুন।

—আমরা ক'জন, এবং তুমি ও তোমার স্ত্রী ছাড়া এই দ্বীপে আর কেউ আছে ?

—না স্যার।

—তুমি ঠিক জানো ?

—হ্যাঁ স্যার।

—আমরা যার আমন্ত্রণে এখানে এসেছি সেই লোকটিকে মোটেই সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না। তার যে কী উদ্দেশ্য তাই বুঝতে পারছি না। তবে তার উদ্দেশ্য যে শুভ নয় এ কথা স্পষ্ট। শুধু তাই নয়, লোকটা আমাদের সবার পক্ষেই ক্ষতিকর। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। আমি প্রস্তাব করি,

আজ রাতেই আমরা এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যাই।

—কিন্তু স্যার, যাবেন কি করে! এখন তো বোট নেই।

—নেই? কিন্তু তীরের সঙ্গে তোমরা যোগাযোগ রাখো কি করে?

—রোজ সকালে বোট নিয়ে আসে নারাকট। রুটি, দুধ আর চিঠিপত্র দিয়ে যায়। আর কিছু ফরমাস থাকলে পরে তার ব্যবস্থা করে।

—তাহলে কাল সকাল পর্যন্ত আমাদের এখানে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই, ওয়ারগ্রেভ বেশ চিন্তিত ভাবে কথাগুলো উচ্চারণ করেন।

সবাই একমত যে, কাল সকালেই এই দ্বীপ ছেড়ে সবাই চলে যাবে শুধু একজন ছাড়া। সে হলো মার্স্টন। সে বললো, আমি রহস্যের সন্ধান পাচ্ছি। এর সমাধান করবো তবেই এখান থেকে যাবো। তার আগে নয়। আর আমি বিপদে ভয় পাই না।

তারপর টেবিলের উপর থেকে একটা মদের গ্লাস সে তুলে নেয় এবং মুখে ঠেকাবার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ কুঁচকে ওঠে। হাত থেকে তার গ্লাসটা পড়ে যায়, নিজেও পড়ে গেল চেয়ার থেকে টলে।

পাঁচ

ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটে গেল যাতে সবাই হকচকিয়ে যায়। বিস্ময়ে সবাই যেন হাঁ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়া দেহটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

সবার আগে ডাক্তার ছুটে যান এবং হাঁটু গেড়ে বসে নাড়ী পরীক্ষা করতে থাকেন। তারপর গম্ভীর গলায় জানালেন, একী! এ যে আর বেঁচে নেই!

তাদের সেই বিস্ময়ের ঘোর এখনো কাটেনি। এরপর আবার এক চমক। না, না, এ যে তারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না।

গ্রীক দেবতার মত সুন্দর এবং এমন স্বাস্থ্যকান্তি যুবক কখনো এভাবে মারা যেতে পারে! এ কী করে সম্ভব হলো? এর পিছনে কার বা কাদের নোংরা কালো হাতের কারসাজি আছে?

জেনারেল ডগলাস একটু করুণ ভাবে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললেন, বিষম লেগেই কি ছেলেটির মৃত্যু ঘটলো?

—শ্বাসরোধ? হ্যাঁ, তা বলা যেতে পারে। তবে একটু পরীক্ষা করে দেখা একান্ত প্রয়োজন।

কথা শেষ করে ডাক্তার গ্লাসটা তুলে নিয়ে নাকের কাছে ধরলেন। সামান্য একটু তলানি পড়ে রয়েছে। তা আঙুলের ডগা দিয়ে তুলে আলতো করে জিভে ঠেকালেন। তারপর আবার তাকালেন মৃত মার্সটনের মৃতদেহের দিকে। তার ঠোঁট দুটো নীল হয়ে গেছে। একটু বিকৃত।

ডাক্তারের যা বোঝার তা বোঝা হয়ে গেছে। তিনি চেঁচিয়ে বলেন, এ মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। তাঁকে এখন যথেষ্ট উত্তেজিত দেখাচ্ছে।

ভেরা একটু ভয়ের সঙ্গে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে, গ্লাসটায় কিছু ছিল নাকি?

—হ্যাঁ। তবে কি তা এখন সঠিক ভাবে বলা যাচ্ছে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পটাসিয়াম সায়নায়েড ছিল। ফলে সঙ্গে সঙ্গে কাজ করেছে। নইলে এমন কখনো...।

—গ্লাসে? ভেরার সঙ্গে ওয়ারগ্রেভও বিস্মিত।

—হ্যাঁ।

—আপনার কি মনে হয়, ও নিজেই ওর গ্লাসে এমন বিষ মিশিয়েছিল? লম্বার্ডের জিজ্ঞাস্য।

—আত্মহত্যা? ব্লোর হতবাক। আশ্চর্য! এ কী করে সম্ভব!

ডাক্তার জবাব দিতে পারছেন না। ভেরা আস্তে আস্তে কথা বলে ওঠে, না, না, আত্মহত্যা, তা হতে পারে না। এমন সতেজ মানুষ সে চলে গেল! এ ভাবতে পারছি না। সন্ধ্যেবেলা যখন গাড়ি চালিয়ে এলো তখন ওকে দারুণ দেখাচ্ছিল! এই দেবতার মত মানুষটিকে তার

অমর বলে মনে হচ্ছিল। তবে কী ঈশ্বরের কোন কোপে সে মাটিতে এমন করে লুটিয়ে পড়ে আছে।

—মনে হয় আত্মহত্যাই, ডাক্তার বলেন। এ ছাড়া আর কী হতে পারে।

অন্য সবাই মাথা নাড়ে। হ্যাঁ, আত্মহত্যাই হবে।

ইতিমধ্যে অন্য গ্লাসগুলো পরীক্ষা করা হলো। তাতে সন্দেহ করার মত কিছু পাওয়া গেল না। তাছাড়া, মার্সটন ওদিকের টেবিল থেকে নিজেই একটা গ্লাস তুলে নিয়েছিল। তবু কেন সে এমন আত্মহত্যা করতে যাবে? কেন? কেন?

—আমার মনে হচ্ছে এর মধ্যে কোন অজানা রহস্য লুকিয়ে আছে, ব্লোর বলে। আত্মহত্যা করার মতো ও ছিল না।

—আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ এক মত, ডাক্তার চিন্তিত মুখে মাথা নাড়েন।

২

ডাক্তার আর লম্বার্ড ধরাধরি করে মার্সটনের মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে তার ঘরে শুইয়ে দিল। তারপর একটা সাদা চাদর দিয়ে তার মৃতদেহটা ঢেকে দেয়। এই ঘরে তার বিশ্রাম নেবার কথা ছিল। আর সেই মানুষ কী না এখন নিস্তেজ হয়ে পড়ে রয়েছে। কোনদিন জাগবে না।

ওরা নিচে নেমে এলো। সকলে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। এখন যেন সকলেই সবার সান্নিধ্য চায়। আসলে সকলে একটা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে।

—রাত অনেক হলো, এমিলি বললেন, এবার শুতে গেলে হয়।

হ্যাঁ, রাত বারোটা এখন। প্রস্তাবটা উত্তমই। তবু সবাই একটা দ্বিধা আর দ্বন্দ্বে ভুগছে।

—হ্যাঁ, একটু ঘুম দরকার, ওভারগ্রেভ বললেন।

—খাওয়ার টেবিল এখনো পরিষ্কার করতে পারিনি, রজার্স কাঁপা গলায় কথাটা বলে।

—কাল করো, লম্বার্ড বলে।

—তা তোমার স্ত্রী এখন কেমন আছে? ডাক্তার জানতে চান।

—একটু দেখে এসে বলছি।

ও দু' মিনিট পরে ফিরে এসে জানায়, ঘুমচ্ছে।

—ওকে এখন আর জাগিও না।

—না স্যার। এবার খাওয়ার ঘরটা একটু ভদ্রস্ত করে তালা লাগিয়ে আমি শুতে যাবো।

—হ্যাঁ, তাই করো।

তারপর রজার্স চলে গেলে ওরা উপরে উঠে গেল। যেন কতগুলো মৌন মানুষ মিছিল করে চলেছে।

৩

ঘরে ক্লান্ত ভাবে প্রবেশ করে ওয়ারগ্রেভ নৈশ পোশাক পরে শুতে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। হঠাৎ তাঁর এডওয়ার্ড সেটনের কথা মনে পড়ে যায়। সুন্দর ভাবে সেদিন কথাগুলো সে বলেছিল। ওর উকিল ম্যাথুসও চমৎকার সওয়াল করেছিলেন। সত্যি অদ্ভুত। যেমন অকাট্য যুক্তি, তেমন ভাষার বাঁধুনি।

সরকার পক্ষে উকিলটা একবারে অপদার্থ ছিল। খুব বাজে ভাবে সওয়াল করছিল।

তারপর ওয়ারগ্রেভ টেবিলের উপর থেকে ঘড়িটা তুলে নিলেন। এরপর দম দিয়ে আবার ওখানেই রাখলেন।

হ্যাঁ, সেটনকে একের পর এক জেরা করা হয়েছিল। সে সুন্দর ভাবে উত্তর দিয়ে গেছিল। এতটুকু উত্তেজিত, বা ভয়ে থতমত খেয়ে যায়নি। ফলে জুরিরা ওর প্রতি প্রভাবিত হয়েছিল। ও বেকসুর খালাস পাবে এ কথাই বোধ হয় সবাই জানতো।

তারপর ওয়ারগ্রেভ বাধানো দাঁত দুটো খুলে একটা গ্লাসের মধ্যে জলে ডুবিয়ে রাখলেন। দাঁত খোলার পর তাঁর গাল চুপসে গেছে। তাঁকে এখন কিছুটা অন্য রকম দেখাচ্ছে।

না, সেটন মুক্তি পায়নি। তাঁর রায়েই ওর দফারফা সব শেষ।

আলোটা যেন আর ওয়ারগ্রেভ সহ্য করতে পারছেন না। তিনি বাঁ হাত দিয়ে আলোটা নিবিয়ে দিলেন। আলোর মুখোমুখি তিনি দাঁড়াতে কী ভয় পাচ্ছেন!

৪

রজার্স তার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ঘর পরিষ্কার করে সে চার-দিকটা একবার ভালো করে দেখে, আর তখনই ঘটনাটা তার চোখে পড়ে যেতে সে আঁতকে ওঠে।

না, না, এমনটা তো হতে পারে না। একটু আগেও সে ওখানে দশটা পুতুল দেখেছে। এখন তার জায়গায় রয়েছে ন'টা পুতুল। একী করে সম্ভব? কী করে?

৫

ঘুম আসছে না জেনারেল ডগলাসের। তিনি শুধু বিছানায় এপাশ ওপাশ করছেন। ঘর অন্ধকার। তাতেও তিনি যেন স্পষ্ট অর্থার রিচমণ্ডের মুখখানা দেখতে পাচ্ছেন।

তিনি নিজে ঐ তরুণ অফিসারটিকে পছন্দ করতেন, আর ওকে দেখে তাঁর স্ত্রী লেসলিও খুশী হয়েছিল। অথচ অন্যদের দেখলে বলতো, দূর! ওটা একটা বোকা। চাহনি দেখছো না! অর্থাৎ কাউকে দেখলে তার সম্বন্ধে কিছু না কিছু বিরূপ মন্তব্য করবেই। এমন নাক উঁচু মেয়ে মানুষ ছিল। কিন্তু সেই ব্যতিক্রম ঘটলো রিচমণ্ডের ক্ষেত্রে।

তারপর খুব ভাব হয়ে গেল দু' জনের মধ্যে। এক সঙ্গে গল্প করা। আলোচনা হত খেলা, গান বা কোন ছবি নিয়ে। আবার মাঝে মাঝে লেসলি ইচ্ছে করে রিচমণ্ডকে রাগিয়ে দিয়ে আনন্দ পেত। তবে এর মধ্যে স্নেহের ভাবটাই বেশী ছিল। পরে আবার লেসলি তার মান ভাঙাতো। এ সব দেখে তিনি খুশী হতেন।

কিন্তু স্নেহ না, ছাই। সত্যি, সেদিন কী ভুলটাই না করেছিলেন!

ওদের অবাধে মেলামেশার সুযোগ দিয়েছিলেন। ওদের বয়সের পার্থ্যকটা তিনি ভুলে গেছিলেন। তখন লেসলির বয়স ছিল উনত্রিশ, আর রিচমণ্ডের আঠাশ।

তিনি ভালোবাসতেন লেসলিকে। ও সুন্দরী ছিল। ওর মাথায় এক রাশ সোনালী চুল ছিল। নীল চোখে ওকে দারুণ লাগতো। আর ওকে তিনি দারুণ বিশ্বাস করতেন।

হ্যাঁ, সেই বিশ্বাসের প্রতিদান তিনি পেয়েছেন, কিন্তু এমন ভাবে যে পাবেন তা তিনি আদৌ ভাবতে পারেন নি। এক সময় তিনি সব জানতে-পারলেন।

কিন্তু ওরা? তা জানতে পারলো না। ওরা মেতে রইলো নিজেদের নিয়ে। সে এক বিচিত্র উন্মাদনা ওদের।

উঃ, সে সময় তিনি কী এক মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিলেন! তখন তিনি ফ্রান্সে ছিলেন। রিচমণ্ডও সেখানে। মাঝে মাঝে সে যেত দেশে —ইংল্যাণ্ডে। লেসলিও ছিল ওখানে। দেশের প্রতি টানের ব্যাপারটা তার কাছে ধরা পড়লো। হঠাৎ রিচমণ্ডকে লেখা লেসলির একটা চিঠি তাঁর হাতে এসে যায়।

তিনি সব জানতে পারলেন। ওদের গোপন অভিসারের কথা। তারপর তিনি রিচমণ্ডকে মৃত্যুর মুখে পাঠালেন। তখন লড়াই প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তবু ফ্রান্সে কয়েকটা সুরক্ষিত ঘাঁটি ছিল শত্রু-পক্ষের। তারই একটায় আক্রমণ করার নেতৃত্ব দিলেন রিচমণ্ডকে। ও আর ফেরেনি।

রিচমণ্ডের মৃত্যু সংবাদ তিনি লেসলিকে জানিয়েছিলেন। লেসলি নিশ্চয়ই কেঁদেছিল। কাঁদুক। তখন তিনি যাননি। গেছেন দেরি করে।

যুদ্ধ শেষ হলো। তারপর দেশে ফিরলেন তিনি। ফিরে তিনি লেসলিকে ব্যাপারটা জানতে দেননি। চমৎকার অভিনয় করে গেছেন।

এর চার বছর পরে লেসলি নিউমোনিয়ায় মারা যায়। তিনি

ভেবে দেখলেন, তারপর আজ ষোল বছর পার হয়ে গেছে।

কিন্তু এত দিন পরে আজ কে রিচমণ্ডের কথা জানালো ? তিনি তো কাউকে এ কথা বলেননি। তবে ?

বাইরে সমুদ্রে ঢেউ ওঠার গর্জন। এখন সেই শব্দটা আরো জোরে শোনা যাচ্ছে।

তাঁর হঠাৎ মনে হলো, তিনি এখান ছেড়ে আর কোথাও যেতে পারবেন না। তিনি রণ ক্লান্ত। আর যেতেও চান না। এখানে তাঁর শান্তি। চির শান্তি।

৬

ঘুম আসছে না ভেরার চোখেও। সে চুপ করে শুয়ে আছে। তার চোখ খোলা। ঘরের ছোট আলোটা জ্বলছে। সে অন্ধকার ঘরে শুয়ে ভয় পাচ্ছিল। মনের মধ্যে নানা চিন্তা তার ঘুরপাক খাচ্ছে।

হঠাৎ তার হুগোর কথা মনে পড়ে যায়। মনে মনে সে বলে ওঠে, হুগো, আজ তুমি কোথায়। তবে আমার কি মনে হচ্ছে জানো, তুমি আমার খুব কাছে রয়েছো। খুব কাছে।

কিন্তু সে কিছুতেই আর হুগোর কথা ভাববে না। তবু কী ওর কথা সে না ভেবেথাকতেপারছে! মনকে দখলে রাখা বড় শক্ত ব্যাপার মনের যেন পাখা রয়েছে। কখন কোন ডালে গিয়ে বাসা বাঁধবে তা কে জানে?।

করনওয়াল...।

কালো কালো পাহাড়ে ঘেরা জায়গা। চারদিকে রাশি রাশি নরম হলুদ বালি। নীল আকাশ। সামনে সমুদ্র।

ছোট আর মিষ্টি দুষ্টু ছেলে সিরিল। শ্রীমতী হ্যামিলটন তার মা।

সেদিন সন্ধ্যোয় ভেরা সিরিলকে ঘুম পাড়িয়ে নিজের ঘরে ফিরে যাচ্ছিল। তার ফেরা হলো না। সে বাধা পায়। নিচু গলায় পিছন থেকে ডাক এলো, ভেরা।

—কে ? ভেরা পিছন ফিরে তাকায়। ও হুগো, তুমি ?

—চলো, একটু বেরিয়ে আসি। যাবে ?

—চলো।

নির্জন সমুদ্র তীর। দু' জনে পাশাপাশি বসেছে। ওদের মধ্যে টুকরো টুকরো কথাবার্তা চলছে।

—ভেরা!

—বলো।

—ভেরা, আমি তোমায় ভালোবাসি।

—আমি কি তা জানি না!

—এমন কথাও তো আছে যা তুমি জানো না!

—কি কথা?

—আমি খুব গরীব। তাই তোমার আমার মাঝে ব্যবধান চিরদিনই থাকবে।

—কি যা তা বলছো! আর তুমি যদি গরীব হও তাতে কী এসে যায়! গরীব যদি বলতে হয় তো আমাকে।

—ভেরা, তুমি জানো না। সমস্ত সম্পত্তির অধিকার দাদার। অবশ্য আমি সম্পত্তির মালিক হতে পারতাম যদি...।

—যদি কী?

—কিছু না। এমনি বলছি। দাদার তো অনেক বয়স হলো। সবাই ধরে নিয়েছিল দাদার আর ছেলেপুলে কিছুই হবে না। আমিই সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবো। তারপর হলো সিরিল। সে যদি ছেলে না হয়ে মেয়ে হতো তবে ভালো হতো। যাক্, সিরিল বেঁচে থাকুক। আমি ওকে খুব ভালোবাসি।

ভেরা মুখে কিছু বললো না। সে জানতে পারলো হুগোর মনের কথা। সে সত্যিই ভালোবাসতো তার ভাইপোকে।

তার পরের দিন ব্যাপারটা ঘটে গেল। শেষ দুষ্টুমি করে গেল সিরিল। কিন্তু সত্যিই কী সেদিন ভেরা সিরিলকে বাঁচাতে পারতো না! সে জানে, সে বাঁচাতে পারতো। কিন্তু তখন তার অশান্ত মনে কী যে হয়েছিল! সে পারেনি। অর্থাৎ তার অশুভ মন তা হতে দেয়নি! হে ঈশ্বর, ক্ষমা করো।

ভগবান কী তাকে ক্ষমা করেছেন? তা সে জানে না। কিন্তু একজন ক্ষমা করেনি। সে হলো হুগো। ঐ ঘটনার পর সে ওর মুখোদর্শন পর্যন্ত করেনি।

তবু সে হুগোকে বোঝাতে চেয়েছে। বলেছে, হুগো, তুমি আমায় ভুল বুঝো না। আমি যে তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। তা তুমি বুঝতে পারছো না কেন? কেন?

সে আর বিছানায় শুয়ে থাকতে পারছে না। বিছানা ছেড়ে উঠে একটা ঘুমের ওষুধ খেলো। তারপর আয়নার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারে না। সরে আসে। আয়নায় নাকি অপরাধীর মুখ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এরপর টেবিলের উপর হাত দুটো রেখে মুখ গুঁজে বসে থাকে।

রাত একটু একটু করে ভোরের দিকে এগিয়ে চলে।

ছয়

ডাঃ আর্মস্ট্রং স্বপ্ন দেখছেন। কে যেন তাঁকে ডাকছে।

না, না, স্বপ্ন নয়। কে যেন তাঁকে সত্যি ডাকছে। তাঁর তন্দ্রা ভাবটা কেটে যায়। দরজায় কে যেন মৃদু ধাক্কা দিচ্ছে। তিনি ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসলেন।

দরজা খুলে ডাক্তার রজার্সকে দেখতে পান, কে? ও রজার্স? কি বলছো? তোমার কি হয়েছে? এ কী? তুমি কাঁদছো কেন?

—আমার স্ত্রী...।

—কী তোমার স্ত্রীর?

—আমার ডাকে আর সে সাড়া দিচ্ছে না। আমার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না।

—চলো, দেখি গিয়ে ব্যাপারটা, বলে ডাক্তার ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে রজার্সের ঘরে উপস্থিত হলেন।

বিছানার পাশে গিয়ে বসলেন ডাক্তার। তারপর আস্তে রজার্সের স্ত্রীর হাতটা তুলে নিলেন। সে হাত ঠাণ্ডা। তবু তিনি চোখের পাতা আঙুল দিয়ে দেখলেন। এরপর সোজা হয়ে বসে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলেন।

রজার্স শুকনো ঠোঁটে একবার জিভটা বুলিয়ে নিয়ে বললো, ও কী আর বেঁচে নেই ?

—হ্যাঁ, ও মারা গেছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটালো। ডাক্তার এক দৃষ্টিতে রজার্সের স্ত্রীর দিকে চেয়ে আছেন। ভাবছেন, কেমন করে এর মৃত্যু ঘটলো ? এর পিছনেও কী মার্সটনের মত কোন রহস্য রয়েছে ?

রজার্স কোন কথা বলতে পারছে না। তার দু'চোখে জল। সে মুখ নিচু করে মৃতা স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

ডাক্তার আর একবার মৃতদেহ পরীক্ষা করলেন। তারপর বিছানা, বিছানার পাশের টেবিলটা, ওয়াশস্ট্যাণ্ড ইত্যাদি সব একে একে দেখলেন।

—স্যার! রজার্স আস্তে আস্তে ডাকে।

—বলো।

—ও কি হার্টফেল করলো ?

ডাক্তার প্রথমটা এ প্রশ্নের জবাব দিলেন না। তারপর জিজ্ঞেস করেন, তোমার স্ত্রীর স্বাস্থ্য কেমন ছিল ?

—একটু বাতের ধাত ছিল।

—কোন ডাক্তার ওকে দেখিয়েছিলে ?

—না।

—তবে ওর হার্টের অসুখ ছিল একথা কেন তোমার মনে হলো ?

—আজ্ঞে না, এমনি বললাম, রজার্স একটু থতমত খেয়ে যায়।

—রজার্স, তোমার স্ত্রীর ঘুম কেমন হতো ?

—এমনিতে ওর ভালো একটা ঘুম হতো না।

—এমনিতে মানে ? ঘুমের জন্য ও কী কোন ওষুধ খেতো ?

—না।

ওয়াশস্ট্যাণ্ড ডাক্তার আর একবার ভালো করে পরীক্ষা করলেন। সেখানে সাবান, পাউডার, ক্রীম, চুল বাঁধার ফিতে, আর সব মেয়েলি টুকিটাকি জিনিস রয়েছে। ঘুমের কোন ওষুধ সেখানে পেলেন না। সারা ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজেও ঘুমের ওষুধের কোন-হদিস মিললো না।

—ও গত কয়েক বছরের মধ্যে ঘুমের ওষুধ খায়নি, রজার্স জানায়। শুধু গতকাল রাতে...।

—থামলে কেন? বলো? গতকাল রাতে কী?

—গতকাল রাতে আপনি যে ওকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন তাছাড়া আর কোন ওষুধ ও খায়নি।

—ও।

২

প্রাতরাশের ঘণ্টা পড়তেই সকলে খাবার ঘরে এসে হাজির হয়। এই ঘণ্টার আওয়াজ শুনবার জন্য সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

একটু আগে বারান্দায় ডগলাস এবং ওয়ারগ্রেভ পায়চারি করছিলেন এবং দু'জনে রাজনীতি পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন।

বাড়ির পিছনে একটা উঁচু টিলা। সেইটাই দ্বীপের মধ্যে সব চেয়ে উঁচু জায়গা। ওখানে সকালে বেড়াতে গিয়েছিল ভেরা আর লম্বার্ড। সেখানে গিয়ে তারা আবিষ্কার করলো ব্লোরকে। সে সমুদ্রের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে যেন কি দেখছিল।

তারপর ওদের দেখতে পেয়ে ব্লোর বলে, এখনো মোটরবোটের কোন চিহ্ন নেই।

—ডেভন জায়গাটা যেন কেমন, ভেরা বলে। এখানে সকাল বোধ হয় খুব দেরি করে হয়। তবে একটু বেলা হলে হয়তো বোটটা আসবে।

একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে লম্বার্ড বললো, আবহাওয়া কেমন মনে হচ্ছে ?

—ভালোই। কেন ?

—দিন শেষ হওয়ার আগেই ঝড় উঠবে।

—তাই বুঝি !

প্রাতরাশের ঘণ্টা শুনে ওরা নেমে আসে। লম্বার্ড বলে, বেশ ক্ষিদে পেয়েছে।

—কাল থেকে একটা কথা বার বার মনে হচ্ছে। মার্সটন কেন আত্মহত্যা করলো, ব্লোর বলে।

—আত্মহত্যা ছাড়া আপনার আর কিছু মনে হচ্ছে না ? ভেরা ব্লোর দিকে তাকায়।

—শুধু মনে হলে চলবে না। আত্মহত্যা ছাড়া খুন হলে তার প্রমাণ চাই। তেমনি জানা দরকার এর পিছনে কি উদ্দেশ্য ছিল।

ওরা তিনজনে বাড়ির কাছে পৌঁছলে এমিলি জানলা দিয়ে ওদের দেখে বললেন, বোট আসছে ?

—না, কিছু দেখলাম না, ভেরা জানায়।

খাওয়ার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে রজার্স। ওরা সবাই প্রবেশ করতে সে ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে খাবার আনতে গেল।

—লোকটার কি হয়েছে আজ ? ভেরা বলে। কেমন যেন ওকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। অথচ কাল তো এমন দেখাচ্ছিল না।

ডাক্তার জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি একটু এগিয়ে এসে সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, রজার্সে'র ত্রুটি আজ মার্জনা করবেন। হয়েছে কি...। আজ ওকে একাই সব করতে হচ্ছে। ওর স্ত্রী ওকে আজ সাহায্য করতে পারেনি।

—কেন ? কী হয়েছে তার ? এমিলি জানতে চান।

—আসুন, তার আগে খাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক্, ডাক্তার সহজ

ভাবে কথাটা বললেন। তারপর আপনাদের সকলের সঙ্গে একটু আলোচনা আছে।

প্রাতরাশের পাঠ চুকতে ডাক্তার কথাটা বললেন। জানালেন, একটা দুঃসংবাদ আছে। রজার্সের স্ত্রী ঘুমন্ত অবস্থায় মারা গেছে।

একটা আর্তনাদ ভেরার কণ্ঠস্বর থেকে বেরিয়ে এলো, উঃ, কী সাংঘাতিক খবর!

চোখ আধবোজা, কিন্তু স্পষ্ট কণ্ঠে ওয়ারগ্রেভ জিজ্ঞেসা করেন, তার মৃত্যুর কারণ কি?

—চট্ করে বলা একটু মুশকিল আছে।

—ময়না তদন্ত হবে নিশ্চয়?

—হওয়া তো উচিত। অন্তত আমি তো না জেনে কোন রকম সার্টিফিকেট দিতে পারবো না। ওর স্বাস্থ্য সম্পর্কে কোন কথাই আমার জানা নেই।

ভেরা বললো, গতকাল ওকে দারুণ নার্ভাস লাগছিল। তারপর সন্ধ্যেবেলা একটা মানসিক আঘাত পেলো। হয়তো সেটা সহ্য করতে না পেরে হার্টফেল...।

—হার্ট যে ফেল করেছে তা নয় বুঝলাম, ডাক্তার বলেন। কিন্তু কি জন্য এবং কোন কারণে তা ফেল করলো তা জানা দরকার।

স্পষ্ট ও কর্কশ গলায় এমিলি বললেন, বিবেকের আঘাতে।

ডাক্তার তাঁর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করেন, আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন?

কঠিন মুখে এমলি বললো, গতকাল ওর এবং ওর স্বামীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা নিশ্চয়ই সবাই আপনারা শুনেছেন।

—কিন্তু আপনি কি মনে করেন সেই অভিযোগ শুনে...।

—হ্যাঁ, আমি অন্তত তাই মনে করি। গতকাল দেখেননি ওকে? ও কেমন করে কাঁদছিল। তারপর অজ্ঞান হয়ে গেল। ওর ভয় করছিল। ওটা হলো গিয়ে পাপের ভয়।

—আপনার কথার মধ্যে অযৌক্তিকতা দেখছি না। সত্যি, ও খুব ভয় পেয়েছিল, কিন্তু ওর স্বাস্থ্য কেমন ছিল তা তো জানা যায়নি। হার্টের দুর্বলতায় যদি কিছু হয়ে থাকে।

—তাকেই আমি বলছি ঈশ্বরের অভিশাপ।

—আপনি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন না কী!

—মোটেই না। ভগবানের অভিশাপে কারুর মৃত্যু হতে পারে এ কথা আপনারা না মানলেও আমি মানি।

এবার বিচারপতি একটু ব্যঙ্গের সুরে বলেন। পাপাকে ঈশ্বর শাস্তি দেন না। দেন আমাদের মতন সাধারণ মানুষ। আর সে শাস্তি দেওয়া সহজ নয়। অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। শেষের দিকে তাঁর গলা ভারী হয়ে ওঠে।

—আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি? ব্লোরের প্রশ্ন।

—করুন, ডাক্তার সায় জানান।

—গতকাল শুতে যাবার সময় রাজর্সের স্ত্রী কিছু খেয়েছিল?

—কিছু না।

—কিছু না?

—না।

—একেবারেই কিছু না? যেমন ধরুন, এক কাপ চা, এক গ্লাস জল, বা ঐ ধরনের কিছু।

—রজার্স আমায় ঠিক ভাবে বলেছে, ওর স্ত্রী শুতে যাবার আগে কিছু খায়নি।

—হ্যাঁ, রজার্স ও কথাটা বলতে পারে।

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। ডাক্তার ব্লোরের দিকে তাকান।

লম্বার্ড ব্লোরেকে বলে, তুমি বুঝি তাই ভাবছো?

ব্লোর দৃঢ়ভাবে জানায়, না ভাববার কী আছে! কাল রাতে অভিযোগ তো শুনলাম। এখন ব্যাপারটা পাগলামো হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। ধরা যাক, অভিযোগটা সত্য। রজার্স আর তার স্ত্রী সেই বৃদ্ধা মহিলাটিকে স্বর্গে যাওয়ার ব্যবস্থা করে

দিয়েছে। এতদিন বেশ দিব্য সুখে ছিল। হঠাৎ কাল...।

—রজার্সে'র বউ কিন্তু মোটেই অস্বস্তি বোধ করেনি, ভেরা কথায় বেশ জোর দিয়ে বলে। এ কথা আমি হলপ করে বলতে পারি।

ব্লোর তাকালো ভেরার দিকে। তার কথার মধ্যে কথা বলতে ভালো লাগছে না। সে তার বক্তব্য পেশ করে, ওদের মনে কোন বিপদের সম্ভবনা ছিল না। অন্তত ওরা তাই ভাবতো। শুধু গত কাল রাতের ঘটনা ছাড়া ঐ কথা শোনার পর ওর স্ত্রী ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। কিন্তু তা দেখে রজার্স দারুণ একটা অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। তা ওর স্ত্রীর অজ্ঞান হওয়া দেখে নয়। তা হয়তো আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন। পাছে ওর স্ত্রী অজ্ঞান অবস্থায় সব কথা বলে বসে। তাহলে ও প্যাঁচে পড়ে যাবে।

একটু থেমে ব্লোর আবার বলতে আরম্ভ করে, তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো যে, ওর স্বামীই এ কাজ করেছে। স্ত্রী যদি অতিমাত্রায় নার্ভাস হয়ে সব কিছু অকপটে স্বীকার করে ফেলে তাহলেই বিপদ। তার চেয়ে স্ত্রীকে সরিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই তার স্ত্রী এখন চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে।

—সব কথা বুঝলাম, কিন্তু ওর বিছানার পাশে কাপটাপ গোছের কিছু তো পাইনি।

—পাবে কী করে! পেলে যে অসুবিধে আছে। আর যে এমন জিনিস খাওয়ায় সে কী আর প্রমাণ স্বরূপ ওখানে কিছু রাখবে। রাখলে যে ধরা পড়ে যাবে। সে সরিয়ে ফেলেছে।

—কিন্তু স্ত্রীকে নিজের হাতে হত্যা করা কী সম্ভব? আস্তে জিজ্ঞেস করলেন জেনারেল ডগলাস।

—সেন্টিমেন্ট সব সময় বড় কথা নয়, আরো বিশেষ করে নিজের জীবন যখন বিপন্ন হয়। আর আপনি বয়সে বুদ্ধিতে সব দিক দিয়ে অভিজ্ঞ। আপনি কী কখনো শোনেননি, কেউ তার স্ত্রীকে নিজের হাতে গলা টিপে হত্যা করেছে, অথবা অন্যভাবে চিরদিনের জন্য পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে!

অন্য সবাই চুপ করে আছে। ইতিমধ্যে ভেজানো দরজা ঠেলে রজার্স ঘরে ঢুকলো।

চেয়ারে তিনি একটু নড়ে চড়ে বসলেন। তারপর ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মোটরবোট এসেছে?

—না স্যার। তবে সকাল সাতটা থেকে আটটার মধ্যে সাধারণত আসে। কিন্তু আজ দেখছি বড্ড দেরি করে ফেলছে।

ঘরের দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা ঘোষণা করলো।

৩

বারান্দায় ওরা দু'জন দাঁড়িয়ে। ব্লোর আর লম্বার্ড।

লম্বার্ড বললো, আমি ভাবছি, এই মোটরবোটের ব্যাপারটা।

—তুমি কি ভাবছো তা আমি জানি না! আমি ভাবছি, মোটরবোটটা আসবার সময় দু'ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। কিন্তু এখনো আসছে না কেন?

—উত্তর পেলে?

—পেয়েছি। ওটা আসবে না। এটা কোন ঘটনা নয়। পূর্ব-পরিকল্পিত।

—তুমি বলতে চাইছো, এটা আগেভাগেই ঠিক করা আছে যে, মোটরবোটটা আসবে না, লম্বার্ড একটু চিন্তিত ভাবে কথাটা বললো।

ওদের পেছন থেকে কে যেন হঠাৎ কথা বলে উঠলো, আসবে না। কোনদিনই আর আসবে না।

ওরা চমকে পিছন ফিরে তাকায়। তাকিয়ে দেখতে পায় ডগলাসকে।

—ও! আপনি, লম্বার্ড বলে। জেনারেল, আপনি কী সত্যি সত্যি ও কথা ভাবছেন?

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জেনারেল বলেন, হ্যাঁ, ভাবছি বই কী। আমরা ভাবছি মোটরবোট আসবে। আমাদের উদ্ধার করবে। মজাটা

ওখানেই। এই দ্বীপ ছেড়ে আমরা কেউ যেতে পারবো না। কেউ নয়। বুঝতে পারছো তোমরা ? এখানেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে সমাধি। চিরশান্তি। শান্তি।

হঠাৎ কথা শেষ করে ফিরে দাঁড়ালেন জেনারেল। তারপর দ্রুত বারান্দা অতিক্রম করে বাগানে নেমে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। ওখান থেকে সমুদ্রের দিকে। এরপর তাঁকে আর দেখা গেল না।

তাঁকে দেখে বড় উদ্‌ভ্রান্ত মনে হচ্ছে। তিনি যেন তাঁর ফৌজী মেজাজ হারিয়ে ফেলেছেন।

৪

বারান্দায় বেরিয়ে এলেন ডাঃ আর্মস্ট্রং। এক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন। তারা ওঁর বাঁ দিকে নিচু গলায় কথা বলে চলেছে। ওরা বলতে সেই ব্লোর এবং লম্বার্ড। আর ডান দিকে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন ওয়ারগ্রেভ। তাঁর মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। সারা মুখে একটা চিন্তার ছাপ।

এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন। তারপর ওয়ারগ্রেভের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যান।

ঠিক সেই সময় রজার্স দ্রুত ডাক্তারের কাছে এসে বলে, স্যার !

—কী ? ডাক্তার একটু চমকে পিছন ফিরলেন।

—একটা কথা ছিল।

—বলো ?

রজার্সের মুখ ফ্যাকাসে। তার হাত দুটো থরথর করে কাঁপছে। কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে তার স্বাভাবিক দীপ্তি।

—স্যার, একটু দয়া করে শুনুন।

—কী হয়েছে তোমার রজার্স ? এত ভয় পাচ্ছো কেন ?

—স্যার, আমার সঙ্গে দয়া করে একটু ভেতরে আসুন।

—কেন ? ঠিক আছে চলো।

রজার্স ডাক্তারকে বসার ঘরে নিয়ে আসে, স্যার, এখানে।

—এখানে কী ?

রজার্সের গলার শিরাগুলো আর পেশীগুলো দপ দপ করছে এবং কাঁপছে। সে কোন রকমে বললো, ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না।

—রজার্স। যা বলবে বলো। অমন ধাঁধায় রেখো না।

রজার্স একটা ঢোক গিলে একটা হাত তুলে ইঙ্গিত করলো, ওখানের ঐ পুতুলগুলো ...।

—হ্যাঁ, পুতুলগুলো কী হয়েছে ?

—দিব্যি করে বলছি কাল সকালে ওখানে দশটা পুতুল ছিল।

—হ্যাঁ, আমিও তা দেখেছি। কাল রাতে খাওয়ার আগে আমরা গুনেছিলাম। তা আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে।

—কাল খাওয়ার পর ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখি দশটা নেই। ভাবলাম বুঝি, ঘুমের চোখে ঠিক গুনতে পারিনি। তারপর আবার গুনে দেখলাম ন'টা।

—এরপর কী কিছু হয়েছে ?

—হ্যাঁ।

—কী ?

—এখন সেই ন'টার জায়গায় কটা আছে জানেন ?

—ক'টা ?

—আটটা।

—আটটা ?

—হ্যাঁ।

ডাক্তর মনে মনে বিড়বিড় করতে থাকে, দু'জন মারা গেছে। সঙ্গে সঙ্গে দুটো পুতুল কম। কিন্তু কমালো কে ? সেই দেহহীন মানুষটা এর পিছনে কাজ করছে ? না, আমাদের মধ্যে কেউ ?

সাত

প্রাতরাশের পর এমিলি ভেরাকে বললো, চলো, আমার দু'জনে গিয়ে

ঐ টিলাটার উপরে বসি।

ভেরা সায় জানিয়ে বলে, চলুন।

একটু বাতাস উঠেছে। তবু বেশ ভালো লাগছে। সমুদ্রের ঢেউগুলো চঞ্চল হয়ে উঠেছে। একটাও জেলে নৌকো দেখা যাচ্ছে না। আর মোটরবোটেরও কোন চিহ্ন নেই।

এমিলি বললেন, গতকাল যে আমাদের এখানে পৌঁছে দিয়েছিল তখন তাকে বেশ নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়েছিল। আজ লোকটার আসবার নাম নেই। কি হয়েছে বলতো?

ভেরা এ কথার কোন জবাব দেয় না। সে রীতিমতন একটু ভয় পেয়ে গেছে। তারপর সে নিজেই নিজেকে বলে, ছিঃ ভেরা, তুমি এই সামান্য ব্যাপারেই ভয় পেয়ে গেলে! তোমার না সাহসী হিসেবে যথেষ্ট সুনাম আছে!

মিনিট দুয়েক চুপ করে থেকে ভেরা বললো, আমার এখানে একটুও ভালো লাগছে না। আমি চলে যেতে চাই।

—কে তোমায় এখানে থাকতে বলেছে! আর এখানে কারই বা ভালো লাগছে বলো!

আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটলো। ওরা টিলার উপর চুপ করে বসে আছে। উভয়ের দৃষ্টি দূরে। সমুদ্রের দিকে। দু'জনেরই আশা, যদি মোটরবোটটা দেখা যায়।

হঠাৎ ভেরা কথা বললো, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

—কি কথা?

—প্রাতরাশের সময় আপনি যে কথা বললেন সে কথা কী সত্যি বিশ্বাস করেন?

—কোন্ কথা? তুমি স্পষ্ট করে বলো।

—রজার্স আর তার স্ত্রী সেই ভদ্রমহিলাকে মেরে ফেলেছে। এ কথা কি আপনি বিশ্বাস করেন?

এমিলি সমুদ্রের দিকে তাকিয়েই আস্তে আস্তে উত্তর দেন, হ্যাঁ,

আমি বিশ্বাস করি। আর একটু তলিয়ে দেখলেই ব্যাপারটা বোঝা যায়। ঐ কথা শোনার পর রজার্সের হাত থেকে ট্রে পড়ে গেল। ওর স্ত্রী অজ্ঞান হয়ে পড়লো। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা 'যায়। ওরা সেই মহাপাপ করেছে। এতে কোন আর সন্দেহ নেই।

—সত্যি রজার্সের স্ত্রী ভয় পেয়েছিল, ভেরা বলে। এত ভয় পেতে আমি কোনদিন কাউকে দেখিনি। ওর মুখে কী দারুণ এক আতঙ্কের চিহ্ন!

—পাপ করলে শাস্তি পেতেই হবে। এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। কথায় বলে, ধর্মের কল বাতাসে নাড়ে।

—কিন্তু সে ক্ষেত্রে...।

—বলো? থামলে কেন?

—অন্যদের সম্পর্কে কী বলবেন আপনি?

—তুমি কী বলতে চাইছো?

—সকলের নামেই তো একটা একটা অভিযোগের কথা শোনা গেল। সবাই আমরা বলছি, ওটা নিছক একটা বাজে কথা। আর আপনি শুধু রজার্সদেরটা বললেন, ওরা মহাপাপ করেছে।

এতক্ষণ ভুরু কুঁচকে এমিলি ভেরার কথাগুলো শুনে যাচ্ছিলেন। এবার তাঁর মুখে আর কোঁচকানো ভাবটা নেই। তিনি বলেন, আমি বুঝতে পারছি, তুমি কি বলতে চাইছো। এই ধরো না কেন লমবার্ডের কথা। সে তো সত্যি কুড়িজন লোককে মৃত্যুর মুখে ফেলে পালিয়ে এসেছিল, ওদের প্রতি সেদিন সে কী অবজ্ঞার পরিচয় দিয়েছিল! বিপদে মানুষই তো মানুষের বন্ধু। সে যে কোন দেশের লোক হোক না কেন। তাদের গায়ের রং কি তাতে কিছু যায় আসে না।

একটু থেমে এমিলি আবার বলেন, কিন্তু কতগুলো অভিযোগ একবারে ভিত্তিহীন। এই যেমন ওয়ারগ্রেভের কথা ধরো না কেন। উনি শুধু তাঁর পবিত্র কর্তব্য পালন করেছেন। আর ব্লোর এককালে পুলিশ অফিসার ছিলেন। তাঁর সম্পর্কেও একই কথা খাটে। আর

আমার নিজের ব্যাপারেও তাই।

একটু চুপ করে থেকে এমিলি আবার বলেন, সব কথাই কী আর পুরুষদের সামনে বলা চলে! তাই কাল আমি চুপ করে ছিলাম। আজ তোমায় আমি বলি।

—বলুন, ভেরা মন দিয়ে এমিলির কথা শুনছে।

—কিছুদিন আগে আমার বাড়িতে একটি মেয়ে কাজ করতো। মেয়েটির নাম বিয়াত্রিচে—বিয়াচিত্রে টেলার। বেশ কেতাদুরস্ত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি সাজ-পোশাক। ওমা! পরে জানতে পারলাম, মেয়েটির স্বভাব চরিত্র মোটেই সুবিধের নয়। তুমিই বলো, বিয়ের আগে কোন মেয়ের পুরুষকে সব কিছু বিলিয়ে দেওয়া উচিত! আর মেয়েটা কি না তাই করেছিল। ছেলেটি ছিল নাকি কোন এক বড় ঘরের। ঐ কাণ্ড ঘটার পর মেয়েটাকে এড়িয়ে যেতে চাইলো। তারপর ছেলেটির এক সময় বড় ঘরের একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়। তখন বিয়াত্রিচের শুধু কান্না আর কান্না। ওদিকে তখন সে আবার মা হতে বসেছে। ব্যাপারটা জানতে পেরে ওকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলাম। আর এই স্বভাবের জন্য নাকি ওর বাবা মার সঙ্গে ওর বনেনি।

—তারপর কি হলো? ভেরা নিচু গলায় জানতে চায়।

—সে কথা আর জিজ্ঞেস করো না। এক মহাপাপ সে করে বসলো।

—কি মহাপাপ?

—আত্মহত্যা করলো। আত্মহত্যা মহাপাপ। নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ও আত্মহত্যা করেছে। খুব বাহাদুরি করলো আর কী! ওর বুড়ো বাবা মায়ের কথা কী একবারও ভাবলো! আত্মঘাতীর কোন গতি হয় বলে শুনেছো!

—মেয়েটিকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া বা ওর ঐ শোচনীয় পরিণতি হওয়ারজন্য আপনার কোন দুঃখ বা কোন অনুশোচনা হয়নি? ভেরা কথাটা বলে এক দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকায়, বা নিজেকে ওর

মৃত্যুর জন্য দায়ী বলে মনে হয়নি ?

—দুঃখ ? অনুশোচনা ? দায়ী ? এর কোনটাই আমার মনে হয়নি, এমিলির স্পষ্ট জবাব। এ সব হতে যাবে কেন! আমি তো কোন অন্যায় করিনি। কাল-সাপকে বাড়িতে দুধ কলা দিয়ে পুষবো!

এরপর এমিলি আবার বলে, সবই তার কর্মফল। সে তার পাপের শাস্তি পেয়েছে। আর এই পাপকে প্রশ্রয় দেওয়ার শিক্ষা আমি কোনদিন পাইনি ভেরা।

কথা শেষ করে এমিলি গম্ভীর মুখে টিলার উপরে বসে থাকেন। সেই মুখ নিষ্ঠুর, হিংস্র বলে ভেরার মনে হয়।

২

ডাক্তার আর্মস্ট্রং বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। একটু তফাতে বসে আছেন বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ। মুখ গম্ভীর। চোখ দুটি বোজা। তিনি কি ভাবছেন কিছু? না ঘুমোচ্ছেন? আর অদূরে নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কথা বলছে লম্বার্ড এবং ব্লোর।

সহসা কি যেন ভাবলেন ডাক্তার। একবার তাকালেন বিচারপতির দিকে। সন্দেহ নেই অতিশয় বিচক্ষণ ব্যক্তি তিনি। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ। তাঁকে নিয়ে ডাক্তারের চলবে না। তাঁর চাই একটু কর্মপটু লোক। মন স্থির করে ফেললেন তিনি। তিনি এগিয়ে গেলেন।

—লম্বার্ড, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল, ডাক্তার বলেন।

লম্বার্ড চমকে ডাক্তারের দিকে তাকায়, কি কথা বলুন।

—আমি একটু তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই।

—পরামর্শ? লম্বার্ড অবাক হয়। আমার সঙ্গে?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু আমি তো ডাক্তার নই।

—না, না, সে কথা নয়। সাধারণ ব্যাপারে।

—তাহলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। বলুন কি বলবেন।

—সত্যি করে বলতো তোমার পরিস্থিতিটা কেমন মনে হচ্ছে ?

একটু চুপ করে থেকে লম্বার্ড বলে, জটিল এবং রহস্যময়।

কথাটা ডাক্তারের বেশ পছন্দ হয়। ভাবেন, লম্বার্ড বেশ বুদ্ধিমান। তিনি বলেন, আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় রজার্সের স্ত্রীর সম্পর্কে ব্লোর যা বলেছে তা সত্যি।

—আমার তো মনে হয় ঠিকই বলেছে।

—ঠিক বলেছো।

—আচ্ছা, যদি ধরে নেওয়া যায়, রজার্সরা ঐ ভদ্রমহিলাকে হত্যা করেছিল। কিন্তু কী ভাবে ? বিষ প্রয়োগে ?

—আরো সহজে ব্যাপারটা ঘটতে পারে, ডাক্তার আস্তে আস্তে বলেন। কথাটা তোমায় আমি বুঝিয়ে বলছি।

—বলুন।

—আমি ঐ ভদ্রমহিলার মৃত্যু সম্পর্কে ওদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাতে যা জেনেছি এবং এই সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতার কথাও তোমায় বলছি।

—হ্যাঁ বলুন, লম্বার্ড একটু উত্তেজিত।

—ঐ ভদ্রমহিলার হার্টের অসুখ ছিল। অসুস্থ বোধ করলেই এক ধরনের ক্যাপসুল খেতে হয়। ওটা সব সময় হাতের কাছে রাখা একান্ত প্রয়োজন। দেরী হলে বিপদ অনিবার্য। সময় মত না খাওয়াতে পারলে মৃত্যু ঘটা আশ্চর্যের কিছু নয়।

—এবার আমি কিছুটা আন্দাজ করতে পারছি।

—পারছো তো ? যখন ও অসুস্থ হয়ে পড়লো তখন রজার্স ওষুধ না দিয়ে ডাক্তার আনার জন্য ছুটোছুটি করতে থাকে। তাতে ওকে সন্দেহ করার কিছু রইলো না। ফলে বিপদ যা ঘটার তা ঘটে গেল।

একটু চুপ করে থেকে লম্বার্ড বললো, এবার আমি সব বুঝতে পারছি।

—কি বুঝতে পারছো ?

—বুঝতে পারছি মিঃ আওয়েনের আমন্ত্রণের অর্থ। এই নির্জন দ্বীপে এনে রাখার অর্থ।

—অর্থ কী ?

—এমন অনেক ঘটনা আছে যার বিচার আইন করতে পারে না। আইনের চোখে সে সব অপরাধী সাজা পায় না। যেমন রজার্সের অপরাধ। এ তালিকায় বিচারপতিও বাদ যাবেন না।

—সে কথা তুমি বিশ্বাস করো ?

—বিশ্বাস করি। এডওয়ার্ড সেটনকে খুন করেছেন ওয়ারগ্রেভ। অথচ তা সম্পূর্ণ আইনের আশ্রয় নিয়ে করেছেন। তখন তিনি বিচারক।

চকিতে ডাক্তারের মনে পড়ে যায়, অপারেশন টেবিলে হত্যার কথা। তাও তো একান্ত গোপনীয় এবং তা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

—তাই এই আওয়েনের সৃষ্টি এবং তার দোসর যেন এই পান্না দ্বীপ। এটা যেন একটা জেলখানা। পালাবার সমস্ত পথ বন্ধ।

—আচ্ছা, কী উদ্দেশ্যে আমাদের সবাইকে এখানে আমন্ত্রণ জানিয়ে এনেছেন ? ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে কথাটা ঘুরিয়ে নিলেন। বললেন, রজার্সের স্ত্রীর কথাটা একটু ভেবে দেখা যাক। তার মৃত্যুর দুটো কারণ থাকতে পারে। এক, গোপন কথা সে ফাঁস করে দিতে পারে, এই আশঙ্কায় তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। আর দ্বিতীয়ত, নার্ভাস হয়ে পড়ে সে আত্মহত্যা করেছে।

—আত্মহত্যা ?

—কেন, তোমার কী মনে হয় ?

—আত্মহত্যা ? হ্যাঁ মনে হতে পারে। এই প্রসঙ্গে মার্সটনের মৃত্যুর কথাটাও কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না। বারো ঘণ্টার মধ্যে দু' দুটো আত্মহত্যায় মন ঠিক মেনে নিতে চায় না। তবে...।

—তবে কী ?

—আমি বিশ্বাস করি না যে, মার্সটন আত্মহত্যা করেছে। বা ঐ ধরনের কিছু একটা করার ইচ্ছে ছিল।

—কথাটা ঠিক, ডাক্তার সায় জানান। তবে পটাসিয়াম সায়নায়েড ওর গ্লাসে গেল কেমন করে? হয় ওটা ও নিজে সঙ্গে করে এনেছিল আত্মহত্যা করবার জন্য আর না হলে...।

ডাক্তার লম্বার্ডকে উস্‌কে দিতে চান, আর না হলে কী?

ডাক্তারের কথায় লম্বার্ড হাসে, আমায় দিয়ে কেন আপনি বলাতে চান। উত্তর তো আপনার জিভের ডগায় রয়েছে। মার্সটনকে হত্যা করা হয়েছে, তাই না?

৩

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ডাক্তার বললেন, আর রজার্সের স্ত্রী? তার ব্যাপারটা কী?

লম্বার্ড একটু ভেবে আস্তে আস্তে বলে, রজার্সের স্ত্রী যদি মারা না যেত তাহলে মার্সটনের মৃত্যুটাকে আত্মহত্যা বলে মনে করতে পারতাম। আবার যদি মার্সটন মারা না যেত তাহলে রজার্সের স্ত্রীর মৃত্যুটাকে আত্মহত্যা বলে ভাবতে পারতাম। মার্সটনের মৃত্যু না ঘটলে রজার্সের স্ত্রীকেও সরিয়ে ফেলার ঘটনা ঘটতো না। আসলে এই দুটো মৃত্যুর মধ্যে সঙ্গত কারণ খুঁজে বার করতে হবে।

—এ সম্পর্কে আমার একটা কথা মনে পড়ছে। তারপর ডাক্তার দুটো পুতুল নিখোঁজ হওয়ার কথাটা জানালেন।

লম্বার্ড কিছুক্ষণ ভাবলো, তারপর সিগারেটটা দূরে ফেলে দিয়ে বললো, দু'জন লোক মারা গেল। সঙ্গে সঙ্গে দুটো পুতুল যেন উপে গেল। এর পিছনে নিশ্চয়ই ঐ পাগল আওয়েন রয়েছে। একটা বিপদ-জনক লোক!

—কিন্তু লম্বার্ড, রজার্স যে বলেছে, এই দ্বীপে আমরা ছাড়া অন্য কোন লোক নেই। তাই আওয়েন...।

—রজার্স হয় মিথ্যে কথা বলেছে, নয় সে ভুল করেছে।

—আমার মনে হয় ভয় পেয়ে মিথ্যে বলেছে।

—আর এদিকে মোটরবোটেরও কোন পাত্তা নেই। এ সবই

আওয়েনের কারসাজি।

এ কথা শুনে ডাক্তার বিবর্ণ হয়ে গেলেন।

একটা নতুন কথা শোনালো লম্বার্ড। বললো, আওয়েন একটা কথা ভেবে দেখেনি।

—সেটা কী?

—এই দ্বীপটা খুব ছোট এবং নির্জন। কারুর পক্ষে এখানে বেশীক্ষণ লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়। একটু চেষ্টা করলেই আমরা সেই লোকটাকে খুঁজে বার করতে পারবো।

—কিন্তু লোকটাকে যে ভয় পাবার কারণ আছে। ওটা একটা খুনে।

—ভয়? ওটা একটা শেয়াল। লম্বার্ড হাসলে। ওর দেখা পেলে ও আমায় ভয় করবে। তারপর সে বলে, চলুন ডাক্তার, আমরা ব্লোরকে দলে নিয়ে যাই। লোকটা ভালো। আর এ ব্যাপারে মেয়েদের কিছু বলে কাজ নেই। জেনারেল এবং জজ সাহেব তো ভয়ে কাত হয়ে পড়েছেন। তাছাড়া, বয়স্ক। অথর্ব বলা চলে। আমরা তিন জনেই কাজটা করতে পারবো।

আট

ওদের কথায় ব্লোর রাজি হয়ে গেল। ঠিক করা হলো সকলে মিলে দ্বীপটা তন্নতন্ন করে খুঁজবে।

ব্লোর বললো, খুব ভালো হতো আমাদের কারুর কাছে যদি একটা রিভলবার থাকতো। কিন্তু এখন আর তা কি করে সম্ভব।

—আমার কাছে একটা আছে, লম্বার্ড প্যাণ্টের পকেটের উপর চাপ দিয়ে দেখায়।

সকলে একটু চমকে উঠে লম্বার্ডের দিকে তাকায়। সেই তাকানোর মধ্যে একটা যেন অশুভ ইঙ্গিত রয়েছে।

ল্লোর বললো, তুমি কী সব সময় রিভলবার নিয়ে বের হও ?

—প্রায়। কারণ অনেক গোলমেলে জায়গায় যেতে তো হয়।

—যাক্, ভালোই হয়েছে। এর চেয়ে গোলমেলে জায়গায় নিশ্চয়ই কখনো যাওনি। আর আওয়েনের কাছে ছোরাছুরি নেই তো ?

ডাক্তার একটু কেশে বললেন, আমার মনে হয় তা থাকবে না। এ ধরনের মানুষরা সাধারণত দেখতে সুন্দর হয়। মানুষ হিসেবে এমনিতে তারা খুব ভালো হতে পারে।

ল্লোর ডাক্তারের কথায় বাধা দিয়ে বলে, আবার নাও হতে পারে।

২

তিনজন মানুষের একটা দল সারা দ্বীপময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাজটা খুব একটা কঠিন নয়। দ্বীপটার এক দিকে সেই ছোট্ট টিলা। টিলার উপরটা বেশ চওড়া এবং সমতল। এখানে গাছপালা কিছু নেই। আড়াল-আবডালও নেই। এবং গুহা-টুহাও কিছু নেই। ফলে ওদের খুঁজতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

ওরা এক জায়গায় জলের ধারে জেনারেল ডগলাসকে চুপ করে বসে থাকতে দেখলো। তিনি দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে আছেন। জায়গাটা খুব নিরালা এবং সুন্দর। তিনি ওদের দিকে একটি বারের জন্যও ফিরে দেখলেন না।

ল্লোর মনে মনে ভাবলো, জেনারেলের ভাব সমাধি হলো নাকি! একটু এগিয়ে গিয়ে গলাটা একটু ঝেড়ে সে আলাপের ভঙ্গিতে বলে, জায়গাটা খুব চমৎকার, তাই না ?

একথায় জেনারেল আদৌ খুশী হলেন না, তাঁর ভুরু কুঁচকে ওঠে। তিনি অশান্ত ভাবে বলেন, আমি এখন একটু একলা থাকতে চাই। আর সময় নেই, সময় নেই।

—কিছু মনে করবেন না, ল্লোর একটু লজ্জা পেয়ে বললো। আমি আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না। এখানে কোন লোক গা ঢাকা দিয়ে আছে কি না, তাই আমরা তিনজনে খুঁজতে বেরিয়েছি।

আপনার সঙ্গে দেখা হলো, তাই কথাটা আপনাকে বললাম।

—তোমরা কিছুই বুঝতে পারছো না। কিচ্ছু না। তোমরা এসো।

ব্লোর আস্তে আস্তে দলের সঙ্গে মিশে বললো, লোকটা একটা আস্ত পাগল।

—কেন, ওঁ তোমায় কী বললো ? লম্বার্ড জানতে চায়।

—একটু একলা থাকতে চায়। বলে, সময় নেই, সময় নেই। কথার মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না।

ডাক্তার কথাটা শুনে নিচু গলায় বিড়বিড় করে বলেন, তাই তো ! এবার আমাদের কি করা দরকার !

৩

সারা দ্বীপ খুঁজে দেখা শেষ হলো। তিনজনে ক্লান্ত হয়ে ডেভনের দিকে চেয়ে থাকে। একটাও নৌকো নেই। তবে বাতাস একটু জোরে বইছে।

—ঝড় আসছে, লম্বার্ড বললো। আমাদের এখান থেকে কেউ দেখতে পেলে ইশারা করতাম। তারও কিছু উপায় দেখছি না।

ব্লোর বললো, রাতে আগুন জ্বালালে কেমন হয় ?

—আমার ধারণা তাতে কোন ফল হবে না। হয়তো আওয়েন আশেপাশে গ্রামের লোকদের বুঝিয়ে বলে রেখেছে, ওখানে কিছু লোক আমোদ প্রমোদ করতে গেছে। ওরা যদি আগুন জ্বালে তাহলে ভাববে, হয়তো ওখানে বসে কোন কাজ করছে।

ব্লোর জলের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বললো, আচ্ছা, এই পাড়ে কেউ লুকিয়ে নেই তো ?

—না, তা হয় না, ডাক্তার মাথা নাড়েন। খাড়া পাড় নিচে নেমে গেছে। ওখানে কারুর পক্ষে লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়।

ব্লোর বলে, ওখানে কোন গর্ত থাকতেও তো পারে।

লম্বার্ড বলে, একটা নৌকো থাকলে দ্বীপের চারপাশটা একবার ঘুরে দেখা যেত।

ডাক্তার হেসে বলেন, নৌকো পাওয়া গেলে তো কোন কথাই ছিল না। আমরা অতি সহজেই এখান থেকে চলে যেতে পারতাম।

—কথাটা সত্যি, লমবার্ড হেসে বলে। কথাটা আমার আদৌ মনে হয়নি। তবে কিনারায় একটা জায়গা আছে, যেখানে একটা লোক অতি সহজেই লুকিয়ে থাকতে পারে। একটা মোটা দড়ি পেলে আমি নিচে নেমে একবার দেখে আসতে পারতাম।

ব্লোর বললো, মনে হয় ওখানে কেউ নেই। তবু সন্দেহ মিটিয়ে নেওয়া ভালো। আমি একটু আসছি। দেখি যদি দড়ি পাই।

ব্লোর চলে যায়। ডাক্তার যেন কি ভেবে চলেছেন। তাঁকে চিন্তিত দেখে লম্বার্ড বলে, ডাক্তার, কি ভাবছেন?

—ভাবছি, ডগলাসের মাথা কতটা খারাপ হয়েছে।

তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে লম্বার্ড বলে, আকাশে আবার মেঘ জমেছে। অন্ধকার হয়ে আসছে।

৪

সারাটা সকাল একটা অস্বস্তির মধ্যে কেটেছে ভেরার। সে যতটা সম্ভব এমিলিকে এড়িয়ে চলেছে সেই কথাবার্তার পর থেকে।

ওদিকে বারান্দায় তিনখানা চেয়ারে তিনজনে বসে আছে। তাদের মধ্যে দূরত্ব খানিকটা করে। তারা হলো ওয়ারগ্রেভ, এমিলি এবং ভেরা।

একটা বড় চেয়ারে বসে আছেন ওয়ারগ্রেভ। মাথাটা সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়েছে।

ভেরার মনে হলো, ওয়ারগ্রেভের সামনে কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে সেই তরুণ এডওয়ার্ড সেটন। আর মাথায় কালো টুপি পরে যেন তার মৃত্যুদণ্ডাদেশ উচ্চারণ করছেন বিচারপতি। তাঁর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলো ভেরা।

ওদিকে আর একটা চেয়ারে বসে উল বুনছেন এমিলি। তাঁর দিকে তাকিয়ে ভেরা ভাবে, এই মুখ কোনদিন সুন্দর, কোমল এবং

মমতা মাখানো ছিল। আজ যেন এ মুখ নিষ্ঠুর, রুক্ষ এবং করুণাহীন হয়ে উঠেছে।

এখানে বসে থাকতে আর ভেরার ভালো লাগছে না। সে চেয়ার থেকে উঠে চলতে আরম্ভ করে দেয়। এবং গেল সে সমুদ্রের দিকে।

—লেসলি! তুমি এসেছো?

—কে? চমকে ওঠে ভেরা।

—ও! তুমি ভেরা, জেনারেল ডগলাস কাতর ভাবে কথাটা বলেন। তুমি কিছু মনে করো না। আমি ভাবছিলাম লেসলির কথা।

ডগলাস সমুদ্রের ধারে বসে আছেন। তাঁর দৃষ্টি সমুদ্রের দিকে। ভেরা তাঁকে প্রথমটা দেখতে পায়নি।

ভেরার মুখ দিয়ে একটা কথা বেরিয়ে এলো। সে জিজ্ঞাসা করলো, লেসলি আপনার কে হয়?

—লেসলি? সে একদিন আমার সব ছিল।

—ও, আপনার স্ত্রী বুঝি?

—হ্যাঁ, আমার স্ত্রী। কী সুন্দর আর প্রাণোচ্ছল ছিল। ওকে আমি দারুণ ভালোবাসতাম। ওকে নিয়ে আমার গর্বের শেষ ছিল না।

—তারপর?

—এরপর আর লুকিয়ে লাভ নেই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি! রিচমণ্ডকে পাঠিয়েছিলাম মৃত্যুর মুখে। এক দিক দিয়ে বিচার করলে তার মৃত্যুর কারণ আমি। অবশ্য তখন তা কিন্তু আমার মনে আদৌ তা মনে হয়নি। সারাজীবন আইন মেনে চলেছি। আইন ও শৃঙ্খলার বাইরে এতটুকু যাইনি। না, না, আমার কোন খেদ, বা গ্লানি নেই। কিন্তু...।

—কিন্তু কী?

—লেসলি কিন্তু এ কথা জানতো না। তার সঙ্গে একটা দিনের তরে খারাপ ব্যবহার করেনি। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার, সে যেন দিনের পর দিন কেমন বদলে গেল। আমার কাছ থেকে যেন

অনেক দূরে পাড়ি দিল। এরপর সে আমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেল। আজ আমি একলা। একবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছি।

দু'জনের কেউ আর কোন কথা বলছে না। তারপর নীরবতা ভঙ্গ করে ভেরা বলে, আপনার এখানে বসে থাকতে ভালো লাগছে?

—দারুণ, দারুণ ভালো লাগছে। খুব সুন্দর শান্ত নিরালা স্থান। অপেক্ষা করার মত আদর্শ স্থান।

—অপেক্ষা? কিসের? বা কার জন্য?

—জীবনের শেষ ডাকের জন্য।

—না, না, এসব আপনি আদৌ ভাববেন না।

—ঠিকই ভাবছি। এই দ্বীপ ছেড়ে আমার যাওয়া হবে না। শুধু আমার কেন হয়তো কেউই যেতে পারবে না। আর আমি এখানে চিরবিদায়ের প্রতীক্ষায় বসে আছি।

এরপর জেনারেল একটু হেসে বলেন, ভেরা, তুমি আমার কথা ঠিক বুঝতে পারবে না। তুমি ছেলে মানুষ। কী শান্তি এই অবসানে!

—শান্তি?

—হ্যাঁ শান্তি, স্বস্তি দুই। ভারাক্রান্ত হৃদয়ের বোঝা বড় ভার। আর এ বোঝার ভার কেউ বইতে চায় না। পারে শুধু একান্ত আপন ও প্রিয় মানুষটি। কিন্তু সে তো আজ বহু দূরে। তবু আমার সেই বোঝা নামিয়ে দেবার সময় এসেছে। আঃ, কী শান্তি! কী আনন্দ। ভাবতে ভারি সুন্দর লাগে!

ভেরার কেমন যেন ভয় করতে লাগলো ডগলাসকে। সে ওঁর দিকে তাকায়। তাঁর দৃষ্টি দিগন্তের দিকে। ঠোঁট দুটো কাঁপছে। ও যে এখানে আছে তা তিনি যেন একবারেই ভুলে গেছেন।

তারপর ডগলাস নিচু গলায় যেন ফিসফিস করে বলতে থাকেন, লেসলি! লেসলি! প্রিয়া, সাড়া দিচ্ছো না কেন! কেন আমার কাছে আসছো না! আমি যে তোমায় একান্ত করে কাছে পেতে চাই। তুমি আমায় নিরাশ করো না। তুমি আমায় তোমার কাছে নিয়ে চলো। লেসলি! ও লেসলি! আমার কথা শুনতে পাচ্ছো?

ভেরা পা টিপে টিপে ওখান থেকে চলে আসে।

৫

ইতিমধ্যে ব্লোর দড়ি নিয়ে এসে দেখে ডাক্তার পাহাড়ের নিচের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে। তাঁকে দেখে সে জিজ্ঞেস করে, লম্বার্ড কোথায় ?

—আঃ ও লম্বার্ড ? কোথায় যেন গেছে। এখুনি আসবে। আর আমি একটু চিন্তার মধ্যে আছি।

—চিন্তা ? ব্লোর হাসে। আমাদের মধ্যে কেই বা চিন্তার মধ্যে নেই !

—তা ঠিকই, ডাক্তার একটু লজ্জিত হলেন। কিন্তু আমি ভাবছিলাম একটি বিশেষ লোকের কথা। আমরা তো একটা পাগলাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, তাই না ?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, ডগলাস লোকটি কেমন ?

—আপনি কি বলতে চাইছেন, তিনি জিঘাংসু প্রকৃতির মানুষ কী না !

—না, না, আমি ঠিক তা বলতে চাইছি না। অথচ আমি মানসিক রোগের বিশেষজ্ঞ নই এবং ওঁর সঙ্গে তেমন আমার আলাপ পরিচয়ও হয়ে ওঠেনি, যা থেকে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি।

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, ব্লোর বলেই ভাবে। উনি কী যেন একটা আন্দাজ করছেন। সেটা জানা দরকার।

—থাক্, ওসব কথা, ডাক্তার বলেন। এই যে লমবার্ড এসে গেছে।

লমবার্ড এসে দড়িটা একবার ভালো করে দেখে নেয়। তারপর একটা দিক নিজের কোমরে বেঁধে অন্য দিকটা ডাক্তার এবং ব্লোরকে ধরতে বলে, আমার জন্য ভাববার কিছু নেই। দড়িতে টান পড়লে শক্ত করে ধরবেন। আমি যাচ্ছি। বলেই পাড় বেয়ে তরতর করে সে নিচের দিকে নেমে চললো।

ব্লোর নিচু গলায় ডাক্তারকে বললো, নামতে ওর এতটুকু অসুবিধে হচ্ছে না। বেড়ালের মত নেমে চলেছে। আর ও কথা বলার মধ্যে যেন একটা কিসের ইঙ্গিত রেখে গেল।

—বোঝা যায়, এককালে হয়তো পাহাড়ে ওঠা নামার ব্যাপারে বেশ যত্ন নিয়েছিল, ডাক্তার বেশ সহজ ভাবে কথাটা বলেন।

—হ্যাঁ, তা হতে পারে, কিন্তু আমি অন্য কথা ভাবছি।

—কি কথা ?

—কিছু মনে করবেন না, আমি কিন্তু ওকে বিশ্বাস করতে পারছি না।

—না, না, অমন ভাবার কোন সঙ্গত কারণ নেই, ডাক্তার হেসে বলেন। ওর জীবনটা কেটেছে নানা রকম অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে। ও ঠিক আর পাঁচজনের মতন নয়।

—আমি আপনার কথা অস্বীকার করছি না, ব্লোর পাল্টা জবাব দেয়। কিন্তু এমন কিছু অ্যাডভেঞ্চার ওর জীবনে ঘটেছে, যার কথা ও বলতে নারাজ। গোলমালটা সেখানেই।

একটু থেমে ব্লোর আবার বলে, আচ্ছা ডাক্তার, আপনি সব সময় রিভলবার সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ান ?

—না, তা করতে যাবো কেন !

—তবেই বুঝুন। সব সময় ওটা সঙ্গে রাখেন কেন ?

—একটা বাতিক আর কি !

—না, না, ডাক্তার, আপনি এ ভাবে কথাটা এড়িয়ে যাবেন না।

ইতিমধ্যে দড়িতে টান লাগতে দু'জনের কথা বন্ধ হয়ে গেল। একটু পরে দাড়িতে আর টান নেই।

ব্লোর আবার কথায় ফিরে আসে। বলে, বাতিক ? বাতিক তো মানুষের নানা রকম হতে পারে। সব ছেড়ে এ বাতিক কেন। আমি দেখেছি ওর ব্যাগে স্লিপিং ব্যাগ, ছারপোকা মারার পাউডার, জলের বোতল, ফার্স্ট-এড বক্স ইত্যাদি আছে। এখানে আমরা সবাই

বেড়াতে বা ছুটি কাটাতে এসেছি। আমাদের কারুর কাছে এসব জিনিস তো নেই।

ডাক্তারের মুখে দেখে মনে হলো, তিনি ওর কথায় প্রতিবাদ না করলেও অস্বীকার করতে পারছেন না।

একটু পরে লম্বার্ড ফিরে এলো। ওর বুক ওঠা নামা করছে। ও কপালের ঘাম মুছে বললো, না, কেউ কোথাও নেই। যদি থেকে থাকে তো আমাদের মধ্যেই আছে। বাইরে নেই।

৬

সারা বাড়ি তন্ন-তন্ন করে খোঁজা হলো। কেউ কোথাও লুকিয়ে নেই। কোন গুপ্ত স্থানও বাদ যায়নি। তাছাড়া, এখানে খুঁজতে কোন অসুবিধেও নেই। পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে আধুনিক বাড়ি। আশেপাশেটাও তাই। প্রথমে একতলাটা পরীক্ষা করা হলো। এরপর দোতলা।

রজার্স ট্রেতে করে কিছু পানীয় নিয়ে আসছে। তাকে দেখে লম্বার্ড বলে, আশ্চর্য মানুষ এই রজার্স। ঘড়ির কাঁটার মত সব কিছু করে চলেছে।

—সত্যি, পরিচারক হিসেবে ওর তুলনা মেলা ভার, ডাক্তারও এ মন্তব্য করেন।

—ওর বউ বড় ভালো মানুষ ছিল। রান্না করতোও চমৎকার। গত রাতের খাবারের স্বাদ যেন এখনো মুখে লেগে আছে। কথা বলে ব্লোর যেন একটু লজ্জায় পড়লো। এখন কথাটা না বললেই বোধ হয় ভালো হতো।

তারপর দোতলার ঘরগুলো ভালো করে দেখা হলো। দক্ষিণ দিক দিয়ে তেতলার ছাদে ওঠার সিঁড়ি। তা দেখে ব্লোর বলে, একবার ছাদটা দেখলে মন্দ হতো না।

এ কথার পরই একটা শব্দ। তবে শব্দটা যেন কোন ছোট ছেলে বল নিয়ে খেলা করার মতন। ওদিকের ঘর থেকে আসছে

ওখানে রজার্সের স্ত্রীর মৃতদেহ রয়েছে। ঐ ঘরটা পরীক্ষা করে দেখা হয়নি।

ব্লোর পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল নির্দিষ্ট ঘরটার দিকে। বাকীরা তাকে অনুসরণ করে।

আস্তে ব্লোর এগিয়ে যায়। তারপর এক টানে হুট করে দরজাটা খুলে ফেলে। তাতে তিনজনই হকচকিয়ে যায়। দেখতে পায়, রজার্স কতগুলো জামা-কাপড় হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

৭

প্রথমে ব্লোর কথা বলে, রজার্স, কিছু মনে করো না। মনে হচ্ছিল এই ঘর থেকে যেন...। তার কথা বলার মধ্যে একটা লজ্জার ভাব ফুটে উঠলো।

—না, না, আমি কিছু মনে করিনি, রজার্স ধরা গলায় তারপর বলে। আমি আর এ ঘরে কিছুতেই থাকতে পারবো না। তাই হু' চারটে জিনিস নিয়ে ভাবছি ঐ দিকের ছোট ঘরটায় থাকবো।

—হ্যাঁ, তুমি তাই করো, ডাক্তার সায় জানাল ওকে।

আস্তে আস্তে ওরা ঘর থেকে তিনজনে বেরিয়ে এলো। যে খাটের উপর রজার্সের স্ত্রী সাদা চাদর ঢাকা অবস্থায় চিরনিদ্রায় নিদ্রিত সেদিকে কেউই চেয়ে দেখলো না। সম্ভবত ভয়ে।

এবার ছাদ দেখার কথা। জলের ট্যাঙ্কের নিচ ও ভেতরটা দেখা হলো। কিছুই পাওয়া গেল না। এ বাড়ির মধ্যে ছাদটাই যা একটু অপরিষ্কার। ঝাঁট-পাট অনেক দিন পড়েনি।

খোঁজার পালা শেষ। ছাদের উপর একে অপরের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। একটা সত্য সবার কাছেই ধরা পড়েছে যে, আটজন জীবিত এবং ছু'জন মৃত। এ ছাড়া আর কোন লোক এখানে নেই। তবু মুখ ফুটে সে কথা কেউ বলছে না।

লম্বার্ড ওদের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে কথাটা বলে, এখন দেখছি, আমরা সবাই ভুল করেছি। অবশ্য ভুল করার যে কারণ একবারে ছিল তা নয়। এখানে পর পর দুটো মৃত্যু ঘটলো। এ দুটো মৃত্যুর মধ্যে কোন রহস্য নেই। আর সত্যি, এখানে আমরা ছাড়া অন্য লোক নেই।

একথার প্রতিবাদ জানিয়ে ডাক্তার বললেন, ভুল করেছি, একথা অন্তত আমি বলতে পারি না। আত্মহত্যার কেস নিয়ে আমি অনেক নাড়াচাড়া করেছি। আরো যেখানে আমি একজন ডাক্তার। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মার্সটন আত্মহত্যা করার মত মানুষ ছিল না। 'সুইসাইডাল টাইপের' মানুষ সে আদৌ নয়।

লম্বার্ড বলে, তাহলে মার্সটনের ব্যাপারটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়?

—নিশ্চয়ই একটা অ্যাক্সিডেন্ট, ব্লোর তার কথায় বেশ জোর দিয়ে জানায়, তাছাড়া। আর কী হতে পারে?

একটু থেমে ব্লোর আবার বলে, তাহলে রজার্সের স্ত্রীর ঘটনাটা কী? সেটাকে তো আর একটা অ্যাক্সিডেন্ট বলতে পারি না। নাকি সেটাও একটা অ্যাকসিডেন্ট?

—অ্যাকসিডেন্ট? লম্বার্ড প্রশ্ন করে। কিন্তু কী ভাবে?

ব্লোর এ কথার কোন জবাব দেয় না, চুপ করে থাকে। ভাবে, এ কথার উত্তর দেওয়া ঠিক হবে কি না। অথচ সে কিছু বলতে চায়। তারপর বলে, একটা কথা বলবো ডাঃ আর্মস্ট্রং?

—বলো।

—গতকাল রাতে আপনি রজার্সের স্ত্রীকে কোন কিছু খেতে দিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ একটা ঘুমের ওষুধ।

—মাত্রাটা একটু বেশী হয়ে যায়নি তো?

—মানে ? তুমি কী বলতে চাইছো ?

—মানে কিছু না। এ ব্যাপারে আপনার ভুলও তো হতে পারে।

—তোমার কথার কোন মানে হয় না, ডাক্তার প্রতিবাদ জানায়। এমন ভুল হলে কখনো চলে না। এ সব ভুল অন্যদের হতে পারে কিন্তু ডাক্তাদের কখনো হয় না।

—কিন্তু গ্রামাফোনের কথাটা তো আমরা অবিশ্বাস করতে পারছি না। সেখানে আপনাকেও দোষারোপ করা হয়েছে। তাই না ডাক্তার ? ব্লোর চিবিবে চিবিয়ে কথাগুলো উচ্চারণ করে।

ডাক্তারের মত লম্বার্ডও প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, এভাবে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে কোন লাভ আছে ? এটা এখন একটা বিপদের সময় সবার কাছে। আমাদের দেখতে হবে, কি করে আমরা উদ্ধার পাই। তা নয় তুমি গ্রামোফোনের কথা তুলছো। তাতে তুমিও বাদ গেছিলে নাকি !

—রেখে দাও এসব কথা! আমি একেবারে বিশ্বাস করি না। ডাহা মিথ্যে কথা। এসব বলে তুমি আমায় চুপ করিয়ে রাখতে পারবে না। বলে সে লম্বার্ডের দিকে ঘুষি পাকিয়ে এগিয়ে যায়। আর আমি তোমার সম্পর্কেও জানতে চাই।

—আমার ? নিজেকে দেখিয়ে লম্বার্ড জিজ্ঞেস করে।

—হ্যাঁ, আর আমি জানতে চাই, তুমি কেন সঙ্গে রিভলবার এনেছো ? অন্য কেউ তো আনেনি।

—জানতে চাও ?

—হ্যাঁ।

—ব্লোর…।

—কী ?

—তোমাকে যতটা বোকা ভেবেছিলাম, সত্যি তুমি ততটা বোকা নাকি ?

—তা না হয় নাই হলাম। তাই বলে রিভলবারের কথাটা এড়িয়ে যেও না।

—এড়িয়ে যেতে চাই। এখানে কোন রকম বিপদ হতে পারে বলে ওটা আমি সঙ্গে এনেছি।

—তাহলে ঘটনাটা আমি খুলে বলি। অন্য সকলে জানুক যে, তারা যেমন আমন্ত্রণ পেয়ে এখানে এসেছে, আমিও তেমনি। তবে আমার সঙ্গে তাদের তফাৎ যে, তারা চিঠি মারফৎ আমন্ত্রণ পেয়েছেন কিন্তু আমারটা একটু অন্য ধরনের। মরিস নামের একটি লোক বললো, আপনি ওখানে গেলে একটা কাজ পাবেন। কাজটা নাকি সাহসের। আমার নাকি সাহস আছে। আর আমি রাজি হয়ে যেতে ও আমায় কিছু টাকা দেয়।

কথা শেষ করে ব্লোর লম্বার্ডের দিকে তাকিয়ে বলে, তোমার এ ব্যাপারে কিছু বলার আছে?

—না নেই, লম্বার্ড হাসে।

—মরিস নিশ্চয়ই তোমায় আরো কিছু বলেছিল? ডাক্তার বলেন।

—না, আর কিছু বলেনি। তবে এ ব্যাপারে আমি আরও কিছু জানতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে মুখ খোলেনি। আর আমার টাকার প্রয়োজন ছিল। তাই আমি কথা না বাড়িয়ে রাজি হয়ে গেছিলাম। তবে সে এ কথা বলেছিল, কাজটা নেওয়া না নেওয়া তোমার মর্জি।

তারপর ব্লোর লম্বার্ডকে বলে, গতকাল রাতে তুমি এ কথাটা চেপে গেলে কেন।

—আমি চেপে যেতে চাইনি, লম্বার্ড বলে। আসলে আমি আদৌ বুঝতে পারিনি যে, এ রকম একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হবে।

—কিন্তু এখন? ডাক্তারের জিজ্ঞাস্য। নিশ্চয়ই তুমি এখন অন্য রকম ভাবছো?

মুখের ভাব বদলায় লম্বার্ডের। সে মুখ এখন কঠিন দেখাতে থাকে। সে বলে, এখন আমি সবার সঙ্গে একই নৌকোর যাত্রী! জানি না সে নৌকো ভাসবে না ডুববে। আমিও আওয়েনের ফাঁদে পড়েছি।

একটু থেমে সে আবার বলে, মার্সটন এবং রজার্সের স্ত্রীর

মৃত্যু ঘটলো। সঙ্গে সঙ্গে ছটো পুতুল উধাও। এসব ঐ পাগল আওয়েনের কারসাজি। কিন্তু সেই শয়তানটা গেল কোথায় ?

ইতিমধ্যে লাঞ্চের ঘণ্টা বেজে উঠলো।

২

খাওয়ার ঘরের কাছে অপেক্ষা করছে রজার্স। প্রথমে এলো লম্বার্ড। জিজ্ঞেস করে, রজার্স, তোমার রান্না করতে অসুবিধে হয়নি ?

—না। তেমন কিছু হয়নি। প্রচুর টিন ফুড ছিল। তা দিয়ে চালিয়েছি। তবে নারাকটের বোট নিয়ে না আসাটা আমার মোটেই ভালো লাগছে না। কেমন যেন একটা অলুক্ষণে ভাব।

—অলুক্ষণে ? হ্যাঁ, তোমার ধারণাই হয়তো ঠিক।

একটু পরে ঘরে ঢুকলেন এমিলি। তাঁর হাতে কাঁটা আর পশম। তিনি চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, আবহাওয়া কেমন বদলে গেছে। সমুদ্রের তাণ্ডব ক্রমশ বাড়ছে। হয়তো ঝড় উঠবে।

এবার আস্তে আস্তে ঘরে প্রবেশ করলেন বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ। সারা ঘরটা একবার দেখে নিয়ে বললেন, সারাটা সকাল বোধহয় সকলে খুব ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর কথার মধ্যে কেমন যেন একটা খুশীর ভাব।

একটু পরে হাঁপাতে হাঁপাতে ভেরা এলো, আমি একটু দেরি করে ফেললাম। আমার জন্য আপনারা নিশ্চয় অপেক্ষা করছিলেন ?

দেরি করেছো ঠিকই, এমিলি বলেন। তবে জেনারেল এখনো আসেন নি।

সকলে খাওয়ার টেবিলে বসতে রজার্স বলে, আপনারা খেতে শুরু করে দেবেন, না জেনারেলের জন্য অপেক্ষা করবেন ?

এ কথার উত্তরে ভেরা জানায়, উনি সমুদ্রের তীরে বসে আছেন, আজ তাঁকে বড্ড অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। ঘণ্টার শব্দ বোধহয় উনি শুনতেই পাননি।

রজার্স জানায়, আমি তাহলে তাঁকে গিয়ে জানাই, যে, লাঞ্চ তৈরি।

—তুমি পরিবেশন করো সকলকে, ডাক্তার উঠে দাঁড়ান। আমি ওনাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছি।

৩

সমুদ্রের গর্জন শুরু হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে বাতাস। আলাপ যেন জমতে দিচ্ছে না।

ব্লোর বললো, কাল যখন ট্রেনে করে আসছিলাম, তখন এক বুড়ো নাবিক বলছিল, ঝড় আসছে। ও কী করে বুঝলো ?

সবাইকে মাংস দিচ্ছিল রজার্স। হঠাৎ সে থেমে গেল। বললো, কে যেন দৌড়ে আসছেন।

হ্যাঁ তাই তো। পায়ের আওয়াজটা ক্রমশ স্পষ্ট হলো।

মুখে কেউ কোন কথা বললো না। সবাই যেন আর একটা দুঃসংবাদের জন্য মনে মনে তৈরি হচ্ছে। সবার দৃষ্টি দরজার দিকে।

ডাক্তার হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললেন, জেনারেল!

—জেনারেল কী ? ভেরা জিজ্ঞেস করে। মারা গেছেন ?

—হ্যাঁ।

অ্যাঁ! সবাই চমকে উঠে সবার দিকে তাকায়। কারু মুখে কোন কথা নেই। শুধু সমুদ্রের দাপাদাপি আর বাতাসের শব্দ শোনা যেতে থাকে।

৪

ঝড় শুরু হলো। ওদিকে সবাই মিলে ধরাধরি করে জেনারেলের দেহটা বয়ে নিয়ে এলো। তারপর খাবার ঘরের পাশ দিয়ে দোতলায় ওঠবার জন্য সবাই এগিয়ে গেল। ভেরা গিয়ে খাবার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ায়। খাবারের প্লেট সাজানো রয়েছে। কিন্তু কেউ স্পর্শ করেনি।

একটু পরে রজার্স ভেরার কাছে এসে দাঁড়ায়। বলে, দেখতে এলাম ক'টা পুতুল রয়েছে।

—তা বুঝতে পেয়েছি। দেখো ক'টা আছে।

—সাতটা।

৫

জেনারেলের দেহ তার ঘরে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁকে ডাক্তার শেষ বারের মত পরীক্ষা করলেন। তারপর নেমে এলেন এক তলার ঘরে। সেখানে সবাই অপেক্ষা করছে।

এমিলি বসে আছে। তাঁর কোলের উপর উল আর কাঁটা। তিনি বুনছেন না। ভেরা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরেটা দেখছে। ব্লোর বসে আছে। হাঁটুর উপর কনুই। আর হাত রেখেছে মাথায়। অস্থির ভাবে পারচারি করছে লম্বার্ড। ঘরের এক কোণে রাখা একটা বড় আরাম কেদারায় ওয়ারগ্রেভ বসে আছেন। চোখ ছুটো তাঁর বোজা।

তারপর ডাক্তার ঘরে প্রবেশ করতে ওয়ারগ্রেভ জিজ্ঞেস করলেন, কি বুঝলেন ডাক্তার ?

—হার্টফেল বা ঐ জাতীয় কিছু নয়। ভারি কিছু জিনিস দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়েছে, আর তাতেই মৃত্যু ঘটেছে।

ঘরে একটা চাপা ফিসফিসানি উঠলো।

—যে জিনিস দিয়ে আঘাত করেছে সেটা কী আপনি দেখেছেন ?

—না।

—তাহলেও আপনি মনে করেন যে, আপনার সিদ্ধান্তই অভ্রান্ত।

—হ্যাঁ।

ওয়ারগ্রেভকে এবার কেবল গম্ভীর দেখাতে থাকে। তিনি বলেন, আমরা যে কী পরিস্থিতির মধ্যে আছি বোধহয় সবাই বুঝতে পারছেন।

ওয়ারগ্রেভ সারাজীবন মর্যাদার সঙ্গে বিচার করে এসেছেন। আজ জটিল রহস্যময় পরিবেশে কয়েকটি মানুষের নেতৃত্বের ভার স্বভাবত

তাঁর উপর এসে পড়ে। তিনি যেন এদের সভাপতি নিযুক্ত হলেন।

তিনি গলাটা কেশে একটু পরিষ্কার করে বললেন, আজ সকালে আপনারা যখন সবাই ব্যস্ত ছিলেন তখন আমি বারান্দায় চুপ করে বসে ছিলাম। বসে বসে লক্ষ্য করছিলাম, আপনাদের কার্যকলাপ। আপনারা কেন ব্যস্ত ছিলেন তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি। আপনারা সেই গুপ্তঘাতকের সন্ধানে সারা দ্বীপময় খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, তাই নয়?

লম্বার্ড সায় জানায়, হ্যাঁ।

বিচারপতি বলেন, আমার সঙ্গে আপনারা নিশ্চয়ই এক মত যে, রজার্সের স্ত্রীর এবং মার্সটনের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। আর আমাদের সকলকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্যও আওয়েনের মহৎ নয়।

—আওয়েন? রুক্ষ কণ্ঠে ব্লোর বলে। একটা বিপজ্জনক পাগল।

—তা সে পাগল তো ঠিকই। তার পাগলামো নিয়ে আর আলোচনা করে লাভ নেই। এখন আমরা এই বিপদের হাত থেকে কেমন করে উদ্ধার পাবো সেটা ভাবা একান্ত ভাবে প্রয়োজন।

—কিন্তু এই দ্বীপে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই, ডাক্তার জানাল।

—যে অর্থে আপনি বললেন 'কেউ নেই', তা ঠিকই। তা আমি আজ সকালেই বুঝতে পেরেছি। তবু আমি আপনাদের বারণ করিনি, করলে আপনারা হয়তো শুনতেন না।

ওয়ারগ্রেভ একটু থেমে আবার বলেন, আমার ধারণা আপনাদের কাছে বলছি, আওয়েন একটা পরিকল্পনা নিয়েছে, এমন কতগুলো লোককে শাস্তি দেবে যাদের আইন কিছু করতে পারেনি। আর এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করতে সে বদ্ধপরিকার। তার উদাহরণ মার্সটন, রজার্সের স্ত্রী এবং ডগলাস। সঙ্গে সঙ্গে দশটি পুতুলের মধ্যে তিনটি পুতুল উধাও।

ওয়ারগ্রেভ সবার দিকে তাকিয়ে বলেন, পরিকল্পনা কার্যকর করতে হলে তাকে এখানে থাকতে হবে, আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে এখানেই আছে। এবং তা একটি উপায়ে সম্ভব। এবার ব্যাপারটা খুবই স্পষ্ট, সে আমাদের মধ্যেই একজন।

৬

—না! না! তা হতে পারে না, ভেরা কান্না মেশানো গলায় চিৎকার করে ওঠে।

বিচারপতি ভেরার দিকে তাকিয়ে বললেন, ভেরা, তোমার বয়স অল্প, কিন্তু এড়িয়ে চলে তো লাভ নেই। তাতে বিপদ বাড়বে বই কমবে না। নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে একজন আওয়েন। দশজন ছিল তার মধ্যে তিন মৃত। ফলে এরা আমাদের সন্দেহের বাইরে। আর এই বাকী সাতজনের মধ্যে যে কেউ একজন হবে।

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, আশা করি এ ব্যাপারে সকলে আমার সঙ্গে এক মত।

ডাক্তার মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে মন চায় না। ভাবতে খারাপ লাগে। তবু আবার না ভেবেও থাকতে পারছি না। হয়তো আপনার কথাই ঠিক।

ব্লোর বলে, এর মধ্যে আর কোন দ্বিধা নেই। একবারে সত্যি কথা। তবে এই ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই। তা হলো...।

বিচারপতি হাত তুলে থামতে বললেন, অন্য কথায় পরে আসছি। আপাতত জানা দরকার, এ ব্যাপারে সবাই এক মত কিনা।

এমিলি বলেন, আপনার কথাই ঠিক। সন্দেহ নেই আমাদের কারুর মধ্যে শয়তান ভর করেছে।

ওয়ারগ্রেভ এবার লম্বার্ডের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার মত কি?

—আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

—তবে আমি ও কথা বিশ্বাস করি না, ভেরা প্রতিবাদ জানায়।

—আচ্ছা, এবার সাক্ষ্য-প্রমাণাদি একটু যাচাই করে নেওয়া যাক্, বললেন বিচারপতি। তা ব্লোর, তুমি যেন একটু আগে কি বলতে চাইছিলে?

দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে ব্লোরের। অর্থাৎ সে দারুণ উত্তেজিত হয়ে

পড়েছে। সে বললো, লম্বার্ডের কাছে একটা রিভলবার রয়েছে। অথচ গতকাল তা সে স্বীকার করেনি। অবশ্য পরে তা নিজেই স্বীকার করেছে।

মৃদু হেসে এর জবাবে লম্বার্ড বলে, ব্যাপারটা আমি ডাক্তার এবং ব্লোরকে বুঝিয়ে বলেছি। আর আপনাদের সকলের কাছেও বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন। আরো বিশেষ দরকার এই কারণে যে, বন্ধুবর ব্লোর এখনো আমার উপর থেকে সন্দেহ দূর করতে পারেনি। তারপর সে তার বক্তব্য পেশ করে।

তা শুনে ব্লোর বলে, এটা যে তোমার সাজানো গল্প নয় সে বিষয়ে কী প্রমাণ আছে। প্রমাণ ছাড়া আমাদের পক্ষে বোঝা অসম্ভব। অন্তত আমি তাই মনে করি।

তাকে থামিয়ে বিচারপতি বললেন, আমাদের সকলের পক্ষেই কোন প্রমাণ নেই। পরস্পর পরস্পরকে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

একটু থেমে বিচারপতি আবার বললেন, সকলেই বুঝতে পারছেন, আমরা একটা চরম সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। তার মোকাবিলা করা আমাদের পক্ষে একান্ত কর্তব্য। তবে তার আগে একটা কথা জেনে নেওয়া দরকার, আমাদের মধ্যে একজন নেই যাকে আমরা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি!

একথা শুনে ডাক্তার বলে উঠলেন, সুনাম, মর্যাদা এবং সম্মানের কথা যদি বলেন তাহলে আমার দাবী উপেক্ষণীয় নয়।

একটু হেসে বিচারপতি বললেন, মর্যাদা এবং সম্মান বোধ হয় আমারও কিছু আছে। তবে মুশকিল কি জানেন, ডাক্তার ও বিচারপতির অনেক সময় 'পাগল' বলে আখ্যা কপালে জোটে। আর পুলিশের লোকদেরও যে এমন অপবাদ জোটে না তা নয়।

—তবে মহিলারা হয়তো আপনাকে এ অপবাদ দেবেন না, লম্বার্ড খুব আন্তরিকতার সঙ্গে কথাটা জানায়।

তা শুনে বিচারপতি একটু ভুরু কুঁচকে বললেন, মানে তুমি বলতে চাও, মেয়েদের মধ্যে অস্বাভাবিক জিঘাংসবৃত্তি কখনো দেখা যায় না।

—তা হয়তো চাই না, কিন্তু তা সম্ভব যে...।

—তুমি থাম, পরক্ষণে বিচারপতি নিজেকে সংযত করে বললেন। আচ্ছা ডাক্তার, যে জিনিস দিয়ে জেনারেল ডগলাসকে আঘাত করা হয়েছে, তা কী কোন মেয়ের পক্ষে সম্ভব ?

—খুবই সম্ভব।

—খুব বেশী জোরের প্রয়োজন হয়নি ?

—আদৌ নয়।

—তাহলে বুঝুন, মেয়েরা ও কাজটা করতে পারেন। আর রজার্স এবং মার্সটনকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে। এ কাজটা মেয়েরা অনায়াসেই করতে পারে। ফলে মেয়েরা সন্দেহের বাইরে নয়।

—আপনি উন্মাদ! ভেরা চেঁচিয়ে ওঠে। বদ্ধ উন্মাদ!

বিচারপতি ভেরার দিকে তাকিয়ে শান্ত ভাবে বললেন, ভেরা, আশা করি নিজেকে সংযত রাখবে। তারপর সেই দৃষ্টি এমিলির দিকে ফিরিয়ে বলেন, আশা করি আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না।

মেঝের দিকে তাকিয়ে এমিলি বসে আছেন। সেই ভাবেই তিনি জবাব দেন, আমি যে আপনার কথা একবারে বুঝতে পারছি না তা নয়। কাউকে হত্যা করা আমার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। আর এই তিনটে খুনের ক্ষেত্রে তো নয়ই। তবে এখন যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, তাতে আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে সন্দেহ করছি। এবং আমি তো আগেই বলেছি, আমাদের একজনের কাঁধে শয়তান ভর করেছে।

তারপর বিচারপতি বললেন, তাহলে আমরা একমত হলাম যে, আমরা সবাই সন্দেহের তালিকায় রয়েছি।

লম্বার্ড সহসা রজার্সের দিকে তাকিয়ে বলে, আচ্ছা রজার্সকে...।

লম্বার্ডের মুখের কথা বিচারপতি কেড়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁ, রজার্সের ব্যাপারে তোমার কী মনে হয় ?

—আমার মনে হয়, রজার্সকে এ তালিকা থেকে সহজেই বাদ দিতে পারি।

—পারি ? কিন্তু কেন ?

—প্রথমত, ওর মাথায় এত প্যাঁচালো বুদ্ধি নেই, দ্বিতীয়ত, আওয়েনের হাতে ওর স্ত্রী শিকার হয়েছে।

বিচারপতি তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে জানালেন, এ সব ব্যাপারে তোমার অভিজ্ঞতা একবারে সীমিত দেখছি। আমার এজলাসে বহু ব্যক্তি স্ত্রী হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে। এবং তাদের দোষও প্রমাণিত হয়েছিল।

লম্বার্ড বলে, আপনি আমার কথা ঠিক বুঝবেন না। আমি বলতে চাইছি যে, স্ত্রীকে কেউ যে হত্যা করে না তা নয়। ওদের গোপন চক্রান্তের কথা পাছে ওর স্ত্রী ফাঁস করে দেয়, তাই রজার্স ওর স্ত্রীকে হত্যা করেছে, এ কথা অসম্ভব নাও হতে পারে।

বিচাপতি বললেন, তুমি রেকর্ডের কথা শুনেই ওদের দোষারোপ করতে চাইছো। ওরা সত্যি কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল কী না তার তো কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। আর এমনও হতে পারে যে, গতকাল রাতে ওর স্ত্রী বুঝেছে, ওর স্বামীর মাথা খারাপ হয়েছে এবং কোন একটা সাংঘাতিক কাজ করতে পারে। আর তা জেনে হয়তো ওর স্ত্রী এমন ভয় পেয়েছিল।

—ঠিক আছে, আপনার কথাই মেনে নিলাম, লম্‌বার্ড বলে। আমাদের মধ্যে একজনই আওয়েন এবং আমরা সবাই সবাইকে সন্দেহের চোখে দেখছি।

—মান, সম্মান, যশ, প্রতিপত্তির কথা বাদ দিয়ে আমরা কাউকেই সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেবো না। এবার একটা কথা হলো, আমাদের মধ্যে কে বা কাদের পক্ষে মার্সটন, ডগলাস এবং রজার্সের স্ত্রীকে হত্যা করা সম্ভব হতে পারে।

ব্লোর কথা বলার জন্য ছটফট করছিল এবং তা বলে সে নিজের বুদ্ধি জাহির করতে চায়। বলে, ঘটনাগুলো একটু তালিয়ে দেখা যাক্। মার্সটনের ব্যাপারটা সত্যি রহস্যময়। কী হয়েছিল তা বলা বেশ মুশকিল। তবে রজার্সের স্ত্রীর মৃত্যুর ব্যাপারে দু'জনকে সন্দেহ করা চলে। তার মধ্যেএকজন হলো রজার্স স্বয়ং এবং অন্যজন ডাক্তার।

ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে উঠে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, আমি এ কথার আপত্তি জানাচ্ছি।

—ডাঃ আরমস্ট্রং! বিচারপতির কথার মধ্যে যেন কি ছিল। তাতে ডাক্তার আর কথা বাড়ান না। চুপ করে যান।

বিচারপতি বলেন, আপনার বিরক্তি এবং আপত্তির কারণ আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু তথ্যের মুখোমুখি তো আপনাকে দাঁড়াতেই হবে। একথা সত্যি, আপনার এবং রজার্সের পক্ষে তার স্ত্রীকে কিছু খাইয়ে দেওয়া সবচেয়ে সহজ কাজ ছিল।

তিনি আরো বলেন, এই ব্যাপারে অন্যদের কি ভূমিকা ছিল তাও বিচার করে দেখা উচিত। আমরা কী সকলেই সন্দেহের বাইরে? সম্ভবত নয়, তাই না?

ভেরা আগের মত রেগে উঠে বলে, রজার্সের স্ত্রীর ত্রিসীমানার মধ্যে আমি ছিলাম না।

একটু চুপ করে থেকে বিচারপতি বলেন, আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। স্মৃতির উপরও বেশী নির্ভর করতে পারি না। তবু সাধ্যমত আমি ঘটনাগুলো সাজাতে চেষ্টা করছি। ভুল হলে দয়া করে শুধরে দিলে বাধিত হবো। সকলের প্রতি এটা আমার অনুরোধ বলতে পারেন।

তিনি আরো বলেন, রজার্সের স্ত্রী পড়ে যাবার পর মার্সটন এবং লম্বার্ড তাকে গিয়ে সাহায্য করলো। ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে ব্রাণ্ডি আনতে বললেন। তারপর কথা উঠলো ঐ কণ্ঠস্বর কোথা থেকে ভেসে এলো। এরপর আমরা সকলে পাশের ঘরে গেলাম, শুধু মিস এমিলি ছাড়া।

একথা শুনে এমিলির মুখ লাল হয়ে ওঠে। আপনি কী বলতে চাইছেন?

তাঁর কথার কোন জবাব না দিয়ে বিচারপতি আবার বলেন, তারপর আমরা ফের এ ঘরে এসে দেখি, মিস এমিলি রজার্সের স্ত্রীর কাছে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন।

—মানুষের প্রতি একটু দয়া দেখানোও কী অপরাধ! এমিলি যেন ঝলসে ওঠেন।

—আমি শুধু একের পর এক তথ্যগুলো সাজিয়ে যাচ্ছি। তারপর রজার্স ব্র্যাণ্ডি নিয়ে ঘরে ঢুকলো। আর এক্ষেত্রে বলা দরকার, রজার্স তাতে কিছু মিশিয়ে ছিল কী না কে জানে! এর কিছুক্ষণ পরে রজার্স ও ডাক্তার ধরাধরি করে ওকে ওর ঘরে শুইয়ে দিলো। তারপর ডাক্তার তাকে ঘুমের ওষুধ দেন।

ব্লোর বলে, আপনার কথাই ঠিক। এ রকমই ঘটনাটা ঘটেছিল। তবে ঐ ঘটনায় তিনজনের পক্ষে জড়িয়ে থাকা অসম্ভব। ঐ তিনজন হলো আমি, লম্‌বার্ড এবং মিস ভেরা ক্লেথর্ন।

বিচারপতি বললেন, কিন্তু তাই কী? সমস্ত রকমের সম্ভবনাকে হিসেবের মধ্যে ধরতে হবে।

—আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, ব্লোর বলে।

বিচারপতি সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, এখন উপরে তার ঘরে রজার্স স্ত্রী শুয়ে আছে। একবারে ঘুমে অচৈতন্য নয়। এমন সময় আমাদের সবার অলক্ষে পা টিপে টিপে রজার্স ট্যাবলেট অথবা মিক্‌সচার নিয়ে ওর স্ত্রীর কাছে গিয়ে বললো, এটা খেয়ে নাও। তাহলে সুস্থ বোধ করবে। ডাক্তারবাবু দিয়েছেন। তাকে সে খাইয়ে গোপনে ফিরে এলো।

সবাই কিছুক্ষণ কোন কথা বলছে না। তারপর লম্‌বার্ড বলে, আপনার কথা আমি এক বর্ণও বিশ্বাস করতে পারছি না। কারণ তখন আমরা কেউ ঘরে যাইনি। মার্সটনের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছি।

—তখন কেউ যায়নি, কিন্তু তারপর আমরা যে যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়িনি? এরপর ও কিছু করে থাকতে পারে।

—তখন ওদের ঘরে কেউ ঢুকলে তা রজার্স দেখতে পেত। কারণ তখন তো ও ঘরে ছিল।

—না, তা পেতো না। কারণ খাওয়ার গোছ-গাছ করার জন্য ও অনেকক্ষণ নিচে ব্যস্ত ছিল।

ইতিমধ্যে এমিলি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেন, ডাক্তার, আপনার দেওয়া ওষুধ খেয়ে রজার্সের স্ত্রী নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারপর কেউ যদি তখন ওর ঘরে গিয়ে থাকে তাহলে সে তো তখন ওকে ঘুমন্ত অবস্থার মধ্যে দেখেছে, তাই না ডাক্তার ?

—তা অবশ্য সব সময় সম্ভব নয়, ডাক্তার জানান। কারণ এক একটা ওষুধ এক একজনের ক্ষেত্রে এক একরকম কাজ করে। সেটা পরীক্ষা ছাড়া সঠিক ভাবে বলা মুশকিল। আবার এও দেখা গেছে ঘুমের ওষুধ হলেও কাজ হতে কিছু সময় নিয়েছে।

আপনি তো এখন একথা বলবেনই ! লম্‌বার্ড ঝাঁঝালো গলায় কথাটা বলে। তাতে যে আপনার সুবিধে হবে।

ডাক্তার এর জবাবে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে বিচারপতি বাধা দিলেন। বললেন, এভাবে পরস্পরকে হেনস্তা করে লাভ নেই। একটু আগে আমি যে সম্ভবনার কথা বললাম তার মধ্যে অনেকটা সম্ভবনা আছে। আশা করি এটা আপনারা মেনে নেবেন।

ব্লোর বললো, তা নয় মেনে নেওয়া গেল। এরপর ?

৭

—এখন আমরা জেনারেল ডগলাসের মৃত্যুর ব্যাপার নিয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই, বিচারপতি জানান। অবশ্য আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না। আমি সকাল থেকে বারান্দায় বসে ছিলাম। কিন্তু তখন কেউই আমার উপর কোন নজর রাখেনি। তখন আমি সমুদ্র-তীরে গিয়ে থাকতে পারি। তবে আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, আমি ঐ বারান্দায়ই ছিলাম। আমার এজাহারে এ ছাড়া আর কিছুই বলার নেই।

ব্লোর বলে, সকালটা আমি লম্বার্ড এবং ডাক্তারের সঙ্গে কাটিয়েছি। আশা করি তারা আমার হয়ে সাক্ষ্য দেবে।

—তা ঠিকই, ডাক্তার বললেন। তবে তুমি একবার দড়ির খোঁজে বাড়ি গিয়েছিলে !

—হ্যাঁ, গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার দড়ি নিয়ে ফিরে এসেছি।

—না, কিছুটা সময় তুমি নিয়েছিলে।

—দড়িটা কী আমার নাকের ডগায় ঝুলছিল। খুঁজতে কিছুটা সময় লেগেছিল। আর নিলেও সেটা অস্বাভাবিক কিছু ?

বিচারপতি এবার ডাক্তারের দিকে ঘুরে তাকান, ব্লোর যখন দড়ির সন্ধানে গেল তখন আপনি আর লম্‌বার্ড কি একসঙ্গে ছিলেন ?

—হ্যাঁ, তবে লম্‌বার্ড একটু সময়ের জন্য যেন কোথায় গেছিল। কিন্তু আমি ওখানেই ছিলাম।

—হ্যাঁ, গিয়েছিলাম ঠিকই, লম্‌বার্ড সায় জানায়। এই দ্বীপ থেকে ওপারে কি রকম করে খবর পাঠানো যায়, কিংবা কোন জায়গা থেকে পাঠালে সুবিধে হয়, তাই খোঁজ করছিলাম। আর তা তো দু'এক মিনিটের জন্য।

—তা ঠিকই, আর ওটুকু সময় একটা হত্যার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

—তখন কি ঘড়ি দেখেছিলেন ? বিচারপতি বলেন।

—না।

—তাহলে আন্দাজ করে বলেছেন, এমিলি বলেন। এতে সঠিক ভাবে কিছু জানা যায় না। এখন ওদের কথা থাক্। এবার আপনার নিজের কথা বলুন।

—সকালে ভেরাকে নিয়ে একটু বেড়াতে গেছিলাম। তারপর গিয়ে বারন্দায় বসি।

—বারান্দায় ? কই, আমি তো আপনাকে দেখতে পাইনি ?

—আমি পুব দিকটায় ছিলাম। ওদিক দিয়ে তখন বাতাস আসছিল।

—ও আচ্ছা। লাঞ্চ পর্যন্ত আপনি ওখানেই ছিলেন ?

—হ্যাঁ।

—ভেরা, তুমি ?

—সকালে আমি মিস এমিলির সঙ্গে বেড়াতে গেছিলাম। তারপর একা এদিক ওদিক কিছুটা সময় ঘুরে বেড়াই। সে সময় আমি

জেনারেলকে দেখেছিলাম।

—সেটা কখন ?

—কখন ? ভেরা একটু ভেবে বলে। সম্ভবত লাঞ্চের আধ ঘন্টা আগে। এর একটু কম বেশী হতে পারে।

ব্লোর জিজ্ঞেস করে, সেটা কি আমাদের সঙ্গে তাঁর দেখা হবার আগে না পরে ?

—তা আমি কেমন করে বলবো! তবে তখন তাঁকে কিছুটা অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিল।

—অস্বাভাবিক ? বিচারপতি ভেরার দিকে তাকায়। কি রকম ?

—তিনি বলছিলেন, তিনি শেষের জন্য অপেক্ষা করছেন। আরো জানিয়েছিলেন, আমরা কেউ বাঁচবো না। উঃ, শুনে কী ভয় করছিল!

—তারপর তুমি কি করলে ?

—এরপর আমি বাড়ি ফিরে এলাম এবং লাঞ্চের একটু আগে বাড়ির পিছনের বাগানে ঘুরতে গেছিলাম। কারণ সারাটা দিন মনটা অস্থির অস্থির করছিল।

এবার বিচারপাত বললেন, বাকী রইলো রজার্সের সাক্ষ্য। তা শুনে খুব একটা লাভ হবে বলে মনে হয় না।

এরপর রজার্সকে ডাকা হলো। সে বললো, আমি সারা সকাল রান্না-বান্নার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তারপর লাঞ্চের আগে একবার পানীয় পরিবেশন করি। কিন্তু জেনারেলের ব্যাপারে কিছু জানি না। তবে এটা ঠিক, তখন আমি আটটা পুতুল দেখেছিলাম।

—এবার বিচারপতি, আপনি শুনানি সংক্ষেপে বলুন, লম্‌বার্ড বলে।

—আমরা তিনজন মানুষের মৃত্যুর ব্যাপার নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করেছি। তাতে কারুর উপর সন্দেহ করা হয়নি। তবে একথা ঠিক, আমরা কেউই সন্দেহ মুক্ত নই। আমাদের মধ্যেই একজন শয়তান রয়েছে। এখন আমাদের কর্তব্য উপকূলের সঙ্গে যাতে কোন রকম যোগাযোগ করা যায়। তবে এখন অপরাধী কিন্তু খুব সাবধান হয়ে

যাবে। ফলে আমাদেরও যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠতে হবে। অথবা কেউ কোন রকম বুঁঝি নেবেন না।

লম্‌বার্ড বলে। আজকের মত অধিবেশন এখানেই সমাপ্ত হলো।

দশ

ওরা দু'জনে বসে ঘরে কথা বলছে। ওরা বলতে, লম্‌বার্ড আর ভেরা। ঘরটা নির্জন। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। ঘরের শার্সি বন্ধ।

—আপনি বিশ্বাস করেন? ভেরার প্রশ্ন।

—কি বিশ্বাসের কথা, মানে যা বিচারপতি বললেন?

—হ্যাঁ।

—বলা শক্ত। কিন্তু...।

—তবুও আমি তা বিশ্বাস করি না।

—সত্যি, সমস্ত ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য লাগছে। অন্য দুটো মৃত্যুর ব্যাপারে সঠিক ভাবে কিছু বলতে পারছি না, কিন্তু জেনারেলের মৃত্যুর ব্যাপারে তো কোন আর সন্দেহ নেই। একটা হত্যাকাণ্ড।

—এমন যে এখানে ঘটবে তা যেন এখনো ভাবতে পারছি না। মনে হয় যেন স্বপ্ন দেখছি।

—আমারও তাই মনে হয়। এই দুঃস্বপ্নের শেষ হলে যেন বাঁচি।

—ঠিক বলেছেন।

—কিন্তু তা তো হবার নয়। আমরা একবারে বাস্তবের মধ্যে আছি, আমাদের সব সময় সাবধান থাকতে হবে। না হলেই বিপদ।

—আচ্ছা, হত্যাকারী যদি ওদের মধ্যে একজন হয় তাহলে কে হতে পারে?

—একথা বললেও আমাকে ওদের দলেই ফেলছেন, তাই না? আমি হত্যাকারী নই। তারপর লম্‌বার্ড ভেরার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি ভেরা দেবী। আপনার

মত বুদ্ধিমতী মেয়ে আর দেখিনি। এবং আপনার সততার জন্য আমি বাজী রাখতে পর্যন্ত প্রস্তুত।

—ধন্যবাদ! ভেরা নত মুখে বলে।

—আর এই অধমের ব্যাপারে আপনার কিছু বলার আছে! লম্‌বার্ড হেসে ভেরার দিকে তাকায়।

—মানুষের প্রতি আপনার শ্রদ্ধা আছে। সে কথা আপনি এই-মাত্র বললেন। তবে ঐ গ্রামোফোন রেকর্ডে যে অপরাধের কথা আপনার বিরুদ্ধে বলা হয়েছে, তাতে আপনি যুক্ত নন বলেই আমার ধারণা।

—ভুল বলেননি। আমি খুব বাস্তববাদী মানুষ। প্রয়োজনে আমি হত্যা করতেও রাজি আছি। তার আগে লাভ-লোকসানের কথা ভেবে নেবো। তবে এরকম হত্যা কখনো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

একটু থেমে লম্‌বার্ড আবার বলে, বাকী পাঁচজনের মধ্যে আপনি কাকে সন্দেহ করেন? তবে আমি করি কাকে জানেন?

—কাকে?

—বুড়ো ওয়ারগ্রেভকে।

—সে কী? কেন?

—এ বুড়ো জীবনে অনেক কিছু দেখেছে। একদিন বিচারক হিসেবে বিচার করে এসেছে। ভেবেছে, তাঁর ইচ্ছের উপর লোকের বাঁচন মরণ নির্ভর করে। আজও সেটা হয়তো ভুলতে পারেনি। তাই এখন হয়তো স্বয়ং ভগবান হতে চাইছে।

—আশ্চর্য কিছু নয়।

—তা আপনি কাকে সন্দেহ করছেন?

—ডাক্তারকে, ভেরা সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে।

—কেন? আমি তো ওঁকে একটুও সন্দেহ করছি না।

—তার কারণ হচ্ছে, প্রথম দুটো মৃত্যুর কারণ ছিল বিষ। সেই বিষ যোগাড় করা সবচেয়ে সহজ ডাক্তারের পক্ষে। আর রজার্সের বউকে সে ঘুমের ওষুধ দিয়েছিল।

—তা অবশ্য ঠিক।

—আর ডাক্তার পাগল হলে চট করে ধরা যায় না, আর ওঁদের যা খাটুনি হয় তাতে ওধরনের কিছু একটা ঘটতে পারে বই কী!

—কথাটা মিথ্যে নয়। তবে জেনারেলের হত্যার ব্যাপারে আপনি বোধ হয় ওঁকে দায়ী করবেন না। কারণ উনি সারাক্ষণ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। অবশ্য আমি একটু সময়ের জন্য অন্যত্র গেছিলাম। সে সময় ওঁর পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়।

—তখন কিছু না করলেও পরে তো পারে!

—পরে? কখন?

—লাঞ্চের সময়। তখন জেনারেল না থাকায় উনি উঠে গেছিলেন তাঁকে ডাকবার জন্য। এটা বোধ হয় আপনার মনে আছে?

—হ্যাঁ, কিন্তু...।

—এর মধ্যে আর কোন কিন্তু বা কেন নেই। ডাক্তার এ কাজ করেছে। আবার কি রকম বললো, মৃতদেহ পরীক্ষা করে দেখেছি, এক ঘণ্টা আগে মারা গেছে। কে যাবে তাঁর কথার প্রতিবাদ করতে!

—আপনার কথার যুক্তি আমি অস্বীকার করছি না। তবে...।

২

—আচ্ছা মিঃ ব্লোর, আপনি ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারছেন কী! ব্লোরকে জিজ্ঞেস করে রজার্স।

—না, কিছু বুঝতে পারছি না।

—জজসাহেবের কথাটাই কী ঠিক? আমাদের মধ্যে একজন। তাহলে সেই লোকটি কে?

—রজার্স, আমরা সকলেই তো সেই কথাই ভাবছি।

—কিন্তু স্যার, আপনি নিশ্চয়ই কিছু আন্দাজ করছেন, তাই না?

—কিছু একটা আন্দাজ করছি ঠিকই, কিন্তু সেটাই যে ঠিক সে ব্যাপারে নিশ্চয় হবার কোন পথ নেই। তবে সে যেই হোক, সে যেমন

বুদ্ধিমান, তেমনি নিষ্ঠুর। একটার পর একটা খুন ঠাণ্ডা মাথায় করে চলেছে।

—স্যার, আমার মাথায় কিছুই আসছে না। তাই সব সময় ভয়ে কুঁকড়ে আছি।

৩

—আমাদের এখান থেকে চলে যেতেই হবে, ডাঃ আরমস্ট্রং বলেন। তা সে যে কোন ভাবেই হোক।

জানলার ধারে বসে আছেন বিচারপতি। তাঁর দৃষ্টি বাইরের দিকে। চশমাটা বাঁ হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন এবং বাইরের দিকে তাকিয়েই বললেন, আদালতের সামান্য কিছু অভিজ্ঞতা আমার আছে, কিন্তু আবহাওয়া অফিসের কাণ্ডকারখানা আমার এক-বারে অজানা। তবে আকাশের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এ ঝড় জল থামবে না। আর না থামলে বোটের আসার কোন সম্ভবনা নেই।

—তার মধ্যে হয়তো আমরা শেষ হয়ে যাবো।

—না, হবো না, বিচারপতি দৃঢ়তার সঙ্গে জানান। আমি সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করছি।

ডাক্তার ভাবেন, এই বৃদ্ধ বিচারপতির বাঁচবার আগ্রহ খুব বেশী। অথচ তিনি ওঁর চেয়ে কম করে কুড়ি বছরের ছোট হবেন। কিন্তু তিনি বাঁচবার কথা এত দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারছেন না।

তারপর ডাক্তার বিচারপতিকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি কিছু আন্দাজ করতে পারছেন, কার দ্বারা এ কাজ হতে পারে?

—আদালতে যেমন কিছু প্রমাণ করতে গেলে কিছু তথ্যের প্রয়োজন, বিচারপতি বেশ ভেবে উত্তর দেন। আমি এখনো তেমন কিছু সংগ্রহ করতে পারিনি। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এসবের মূলে একজন রয়েছেন।

ডাক্তার কিছুটা অবাক হয়ে ওঁর দিকে তাকালেন, আমি কিন্তু

কিছুই বুঝতে পারছি না।

৪

একটা বড় আকারের বাইবেল এমিলি কোলে নিয়ে বসে আছেন। তাঁর মন বড় অশান্ত। তাই পড়ায় কিছুতেই মন বসাতে পারছেন না। তারপর বাইবেলটা রেখে ড্রয়ার থেকে একটা কালো ডায়েরি বার করেন। একটু ভেবে তাতে লিখতে থাকেন—

একটা সাংঘাতিক ব্যাপার এখানে চলছে। জেনারেল ডগলাস মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। অর্থাৎ তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আজ দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বিচারপতি সুন্দর একটা বক্তৃতা দেন। তার বিশ্বাস যে, আমাদের মধ্যে কেউ এমন কাণ্ড করে চলেছে। অর্থাৎ আমাদের কারুর মধ্যে শয়তান এসে বাসা বেঁধেছে। এটা আমি আগেই ভেবেছিলাম।

এমিলির বোধ হয় ঘুম আসছে। এই পর্যন্ত লিখে টেবিলে মাথা দিয়ে ঘুমে এলিয়ে পড়েন। ডায়েরিটা খোলা রইলো। হাতে ধরা কলম হাতেই রয়ে গেল।

একটু পরে তাঁর তন্দ্রা ভাবটা কেটে যায় এবং তিনি সেই ভাবেই আবার লেখেন—

প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে আলোচনা করে জানতে চান যে হত্যাকারী কে হতে পারে। এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কারুরই জানা নেই। কিন্তু আমি জানি। সেই হত্যাকারীর নাম হলো বিয়াত্রিচে টেলার।

হঠাৎ চমকে ওঠেন এমিলি। ঘুমের রেশটা তাঁর কেটে যায়। ডায়েরির পাতার শেষের অংশটুকু পড়তে থাকেন।

ভাবেন, এ আমি কী লিখেছি? আমি কী পাগল হয়ে গেলাম? নিজের মুখে বিড়বিড় করতে থাকেন। তারপর শেষের দুটো লাইন

(কিন্তু আমি জানি। সেই হত্যাকারীর নাম হলো বিয়াত্রিচে টেলার) এমন ভাবে কেটে দিলেন যাতে পড়া না যায়।

৫

ঝড় ক্রমেই বাড়ছে। সেই সঙ্গে জোরালো হয়েছে হাওয়ার গর্জন। ঘরের মধ্যে সকলেই আছে। কাচের বড় বড় শার্সিগুলো বন্ধ। সবাই যেন এক একজন কয়েদী। সকলের মনই বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। ঘরের মধ্যে মেঘলা দিনের আবছা অন্ধকার।

ইতিমধ্যে চায়ের ট্রে নিয়ে রজার্স ঘরে ঢুকলো। সে ট্রে-টা টেবিলে নামিয়ে রেখে পর্দাটা টেনে দিতে কিছুটা আলোর ভাব ঘরের মধ্যে ফুটে উঠলো।

ভেরা এমিলির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, চাটা আপনি তৈরি করবেন?

—না বাছা, তুমিই করো, এমিলি অক্ষমতা প্রকাশ করেন। আমার পক্ষে চায়ের পটটা বেশ ভারি। তাছাড়া, আমার মন-মেজাজ ভালো নেই।

—কেন, আবার নতুন কিছু হলো নাকি?

—না, তেমন কিছু না। সেই স্কার্ফ'টা বুনছিলাম। তা বোনা বন্ধ হয়ে গেছে। ছুটো উলের গোলা খুঁজে পাচ্ছি না।

—ও, এই কথা, ভেরা আশ্বস্ত হয়। পড়ে-টড়ে গেছে কোথাও। একটু পরেই নিশ্চয় খুঁজে পাবেন।

পেয়ালা-পিরিচের টুং টাং শব্দ। ভেরা চা পরিবেশন করলো। সেই গুমোট ভাবটা অনেকটা কেটে গেল।

একটু পরে রজার্স এসে জানায়, ওপরের একটা ঘরের পর্দা কে যেন খুলে নিয়েছে!

—কোন ঘরের? ব্লোর জানতে চায়।

—একটা স্নানের ঘরের।

—কি রকম পর্দা ছিল?

—লাল সিল্কের।

—ও নিয়ে মাথা ঘামিও না। পর্দা নিয়ে কেউ তো কাউকে খুন করতে যাবে না।

—স্যার, তা ঠিক।

রজার্স চলে গেল। একটু আগের খোলামেলা ভাবটা আর নেই। আবার সকলের মনে সন্দেহের বীজ দানা বেঁধে উঠেছে।

৬

এখন রাত ন'টা বাজে। সবে ডিনার শেষ হয়েছে।

শুতে যাবার জন্য সকলে চেয়ার ছেড়ে উঠলো। তার মধ্যে প্রথমে এমিলি এবং ভেরা।

ওদের দিকে তাকিয়ে ব্লোর বলে, নিশ্চয়ই এদের বলতে হবে না যে, শুতে যাবার আগে দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দিতে হবে।

—তা হয়তো নয়, তবু সকলকে দারুণ ভাবে সাবধানতা অবলম্বন করে থাকতে হবে, বিচারপতি বলেন। সকলকে শুভরাত্রি জানাচ্ছি। আশা করি কাল আবার সকলে এ জায়গায় মিলিত হবো।

ওরা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। ওদের দলে চারজন আছে। তারপর দরজা বন্ধ হবার শব্দ হলো।

ওদিকে রজার্সের অনেক কাজ বাকী। তাকে এখন সব কাজ করতে হচ্ছে। খাওয়ার ঘর পরিষ্কার করে আলো নিবিয়ে দিয়ে ঘরে চাবি দিয়ে দেয়।

তারপর রজার্স নিজের নতুন ঘরে গিয়ে ঢোকে। ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘরটা একবার ভালো করে দেখে নেয়। আলমারি, খাটের তলা ইত্যাদি সব। না, কেউ কোথাও নেই।

আজ রাতে বোধ হয় পুতুল কম হবে না। একই থাকবে। এ কথা ভেবে রজার্স নিশ্চিত হয়ে শুয়ে পড়লো।

এগারো

রোজ সকালে দেরি করে ঘুম থেকে ওঠা বরাবরের অভ্যেস লম্বার্ডের। উঠেও সে কিছুক্ষণ বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। আজও তার ব্যতিক্রম হলো না। তবে সাতটা নাগাদ একবার জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। বৃষ্টি থেমে গেছে। তবে বাতাসের বেগ কিছু কম। তারপর আবার চোখ বন্ধ করে। আটটা নাগাদ বাতাসের বেগ ফের বাড়লো। কিন্তু তখন সে ঘুমিয়ে।

খানিকক্ষণ পরে লম্বার্ড চোখ খুলে টেবিলের উপর থেকে ঘড়িটা তুলে নিয়ে তাকায়, সাড়ে ন'টা বাজে। তারপর সে ঘড়িটা কানের কাছে চেপে ধরে। না, ঠিকই চলছে।

লম্‌বার্ড ভাবলো, না, এবার ওঠা দরকার। কিছু একটা করা উচিত।

লম্‌বার্ড দরজা খুলে বাইরে গেল। এরপর ব্লোরের ঘর বন্ধ দেখে তার ঘরে টোকা মারে।

একটু পরে দরজা খোলে ব্লোর। তাকে দেখে লম্‌বার্ডের মনে হলো, ও একটু আগে ঘুম থেকে উঠেছে।

—কি ব্যাপার ? ব্লোর ঘুম ঘুম চোখে লম্‌বার্ডের দিকে তাকায়।

—ধন্য ! তোমার ঘুম ! কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো ?

—কী ?

—ক'টা বাজে খেয়াল আছে ?

ব্লোর ঘড়ির দিকে তাকায়। তারপর লজ্জিত ভাবে বলে, দশটা বাজতে মাত্র পাঁচ ! ইস ! এত বেলা হয়ে গেছে। আসলে মনটা তো ক্লান্ত এবং অবসন্ন ছিল।

—এত বেলা হওয়ায় তোমায় কেউ ডেকেছিল ? কিংবা চা দিয়ে গেছে ? লম্‌বার্ড জানতে চায়।

—ঠিক বলেছো তো ! তা রজার্সই বা কোথায় !

—আমারও ঠিক একই কথা।

—মানে ?

রজার্স নিরুদ্দেশ। সে তার ঘরে নেই। এমন কি রান্নাঘরেও নয়। উনুনে আগুন ধরায়নি।

—তাহলে কোথায় যাবে ? দ্বীপ ছেড়ে চলে গেল নাকি ? দাঁড়াও একটু, ঠিকঠাক হয়ে নি। তুমি ততক্ষণে অন্যদের খবর দাও।

এদিকে এক একজনের ভিন্ন ভিন্ন চিত্র। ডাক্তার পোশাক পরে ব্রেকফাস্টের জন্য তৈরি হচ্ছেন। ওয়ারগ্রেভকে ঘুম থেকে তুলতে হলো। তারপর তিনি বাথরুমে গেলেন। ভেরা তৈরি হলো। আর এমিলির ঘর ফাঁকা।

একটু পরে ওয়ারগ্রেভ ও এমিলি ছাড়া সকলে রজার্সের সন্ধানে বের হলো। প্রথমে দেখা হলো ওর ঘর। নেই। বিছানা এলোমেলো। শোবার পোশাকটা ঘরের বাঁ দিকে পড়ে রয়েছে। টেবিলের এক কোণে দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম। ব্রাশটা ভেজা। অর্থাৎ সে দাড়ি কামিয়ে নিচে নেমেছে।

ওরা নিচে নেমে এলো। তারপর এসে দাঁড়ায় খাওয়ার ঘরের সামনে। আর ঠিক তখনই এমিলি বাইরে থেকে ফিরলো।

এমিলি বেজার মুখে জানান, সমুদ্রের অবস্থা আজও খুব খারাপ। বোট আসতে পারবে বলে মনে হয় না।

—কিন্তু এই ভাবে একা আপনি বেড়াতে গেছিলেন ? ব্লোর একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বলে। এ ভাবে অযথা কেন ঝুঁকি নেন।

—তুমি থামতো ! এমিলিও পাল্টা জবাব দেন। এ ব্যাপারে আমি যথেষ্ট হুঁশিয়ার।

—তা নয় হলো, লম্‌বার্ড বলে। রজার্সকে দেখেছেন ?

—না সকাল থেকে ওকে দেখিনি। কিন্তু কেন ?

ইতিমধ্যে বিচারপতি দাড়ি কামিয়ে, পোশাক পরে, বাধানো দাঁত লাগিয়ে নিচে নেমে খাওয়ার ঘরে পা দিয়ে বললেন, আরে রজার্স

দেখছি পরিপাটি করে ব্রেকফাস্ট টেবিলে সাজিয়েছে!

হঠাৎ ভেরা বিচারপতির হাত ধরে চিৎকার করে ওঠে, দেখুন, ছ'টা পুতুল রয়েছে!

সবাই ফ্যাল ফ্যাল করে তাই দেখলো।

২

একটু পরে রজার্সের সন্ধান পাওয়া গেল। তবে ও আর বেঁচে নেই। ওর মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। ও রান্না ঘরের পিছনে কাঠ কাঠতে গেছিল, কিছু কাঠ কেটেও ছিল। হাতে ওর ধরা রয়েছে একটা কাটারি। ওর কয়েক হাত দূরে দেয়ালের গায়ে হেলান দেওয়া অবস্থায় একটা রক্তমাখা কুঠার। রক্তের দাগ শুকিয়ে এসেছে। ওর ঘাড়ে গভীর ক্ষতের চিহ্ন। এবং কুঠারের সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক তা বুঝতে কোন অসুবিধে নেই।

বারো

সকালের খাওয়ার পাট কোন রকমে চুকলো। এমিলি আর ভেরা রজার্সের জায়গা নিল। টিনের প্রচুর খাবার আছে। ফলে খুব একটা অসুবিধে হয়নি।

খাওয়ার পর টেবিল পরিষ্কারের কাজে এগিয়ে গেল ভেরা। কারণ এমিলির বয়স হয়েছে। সম্ভবত এ ধকল আর সইতে পারবেন না।

ভেরার কষ্ট হচ্ছে অনুভব করে লম্বার্ড ভেরার দিকে তাকিয়ে বলে, আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে এ কাজে আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

—ঠিক আছে, করুন, ভেরা সায় জানায়।

এমিলি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার বসে পড়লেন।

তা দেখে বিচারপতি বলেন, কী হলো আপনার ?

—ভাবলাম, ভেরাকে সাহায্য করি। উঠতে গিয়ে মাথাটা ঘুরে গেল।

—না, কিছু ব্যস্ত হবেন না, ডাক্তার এমিলিকে বলেন। আপনি একটু বিশ্রাম করুন। যা ঘটছে তাতে মাথা ঘোরার অন্যায় কী ! আপনাকে মাথা ঘোরার জন্য একটা ওষুধ দিচ্ছি।

—না ! না ! আমার কোন ওষুধ লাগবে না, এমিলি হিস্টিরিয়া রোগীর মত চেঁচিয়ে কথা বলেন।

একথা শুনে ডাক্তারের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। এমিলি তাঁকে সন্দেহ করছেন। অন্য সকলে চুপচাপ। ঘরের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ ফুটে ওঠে।

এমিলি সেটা বুঝতে পেরে নিজেকে স্বাভাবিক করে বলে, না, না, ডাক্তার, আমি আপনাকে কোন রকম অপমান করতে চাইনি। মানে আমি ভাবছিলাম, একটু বসে থাকলে আমার মাথা ধরা সেরে যাবে হয়তো, এই আর কি !

—আপনি যা ভালো বোঝেন, ডাক্তার শুকনো গলায় বলেন।

—আমার মনে হচ্ছে সব ব্যাপারটা আর একবার তলিয়ে দেখা উচিত, বিচারপতি সকলের দিকে তাকিয়ে বলেন। তার জন্য আমি প্রস্তাব করছি, চলুন, আমরা সকলে বসবার ঘরে যাই।

শুধু গেল না এমিলি। তিনি ওখানেই চেয়ারে বসে থাকেন। তাঁর মাথা ধরা কমে আসছে। আঃ, কী আরাম। কিন্তু এত ঘুম পাচ্ছে কেন ? আবার কিসের যেন একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। মৃদু গুঞ্জনের শব্দ, তাই না ? না, তাঁর শরীর দুর্বল বলে এ ধরনের কথা তাঁর মনে হচ্ছে। না, ঐ তো জানলার কাছে একটা মৌমাছি। নিরালা ঘরে ওর শব্দ যেন কেমন লাগছে। ভারি ভালো লাগছে। কেমন যেন একটা জাদু আছে।

কে যেন ঘরে প্রবেশ করলো। মাথা ঘুরিয়ে তাকে এমিলি দেখতে চাইলেন। পারলেন না। কে এলো ? দেখতে পাচ্ছেন

না। তার সর্বাঙ্গ যেন জলে ভেজা। তা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। ও কী বিয়াত্রিচ টেলার ?

মৌমাছির গুঞ্জন। শব্দটা তাঁর কাছে এগিয়ে আসছে। তাঁকে হুল ফুটিয়ে দিল নাকি !

২

বসবার ঘরে সকলে এমিলির জন্য অপেক্ষা করছে।

ভেরা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আমি ওঁকে ডেকে আনছি।

—এক মিনিট, ব্লোর ভেরার দিকে তাকায়।

—বলুন।

—আমি বলছি, যিনি এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে রয়েছেন তিনি ওখানে বসে আছেন।

—কিন্তু হঠাৎ এ কথা কেন বলছেন ? ডাক্তার ওকে জিজ্ঞেস করেন।

—বেশী যে ধর্মের ভাব ওঁর মধ্যে। ওটা আমার কাছে ভড়ং বলে মনে হচ্ছে।

—হতে পারে, কিন্তু আপনার কাছে তেমন ‌।ক কোন প্রমাণ আছে ?

—এটা আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, সেই গ্রামোফোনের অভিযোগ সম্বন্ধে আমরা সবাই আমাদের অভিযোগ পেশ করেছিলাম, কিন্তু উনি কিছু বলেননি।

—ও কথা ঠিক নয়, ভেরা ওদের মাঝে কথা বলে। পরে উনি আমায় সব বলেছেন। ও তাদের বিয়াত্রিচে টেলরের কথা জানায়।

—এ কথা শোনার পর আমি আর ওঁকে দোষারোপ করতে পারছি না, বিচারপতি বলেন। অচ্ছা ভেরা, তোমার কি মনে হয়, উনি বিয়াত্রিচের মৃত্যুর জন্য দুঃখিত বা অনুতপ্ত কি না ?

—না।

—কুমারী হৃদয়ে ওসবের কিন্তু বালাই নেই, ব্লোর মন্তব্য করে।

তারপর বিচারপতি হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলেন, ওঁর এতক্ষণে এখানে এসে যাওয়া উচিত নয়?

—এই মহিলা সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নেবেন না? ব্লোর বিচারপতিকে কথাটা বলেন।

—ব্যবস্থা? হ্যাঁ, ডাক্তারকে বলবো ওঁর প্রতি একটু নজর রাখতে। চলুন, এবার আমরা সবাই খাবার ঘরে যাই।

সবাই খাবার ঘরে প্রবেশ করে দেখে, এমিলি তখনো চেয়ারে বসে আছেন। অন্যদের পায়ের শব্দ তিনি শুনতে পাননি। সম্ভবত তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ব্লোর এমিলির দিকে এগিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সে থমকে দাঁড়ায়। সে এ কী দেখছে!

রক্তে ভেসে যাচ্ছে এমিলির মুখ। নীল হয়ে গেছে তাঁর ঠোঁট। দেহে প্রাণ নেই।

৩

—মিস এমিলি আমাদের সব সন্দেহের বাইরে চলে গেছেন, বিচারপতি ধরা গলায় কথাটা বলেন।

ওদিকে এমিলির দেহটা ডাক্তার ভালো করে পরীক্ষা করে দেখছেন। তারপর তিনি বলে ওঠেন, ঘাড়ের কাছে এটা কিসের দাগ?

—মনে হচ্ছে, ওটা কোন কামড়ের দাগ, ভেরা একটু ঝুঁকে এমিলির দেহের দিকে তাকিয়ে বলে। বোধ হয় কোন পোকার।

—না, কোন পোকার এ কাণ্ড নয়, ডাক্তার বলেন। এটা মানুষের কাজ। ওটা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জের চিহ্ন।

—আপনি কী বলতে চাইছেন? বিচারপতি অবাক। ওঁকে ইঞ্জেকশনে বিষ মিশিয়ে হত্যা করা হয়েছে?

—হ্যাঁ, তাই। কোন রকমের সায়ানাইড্। সম্ভবত পটাসিয়াম।

যেটা মার্সটনকে দেওয়া হয়েছিল। অ্যাসফিকসিয়েশন—মানে শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু ঘটেছে।

হঠাৎ জানলার কাছে একটা মৌমাছি দেখা গেল। শোনা যায় তার গুঞ্জন শব্দ। ভেরা সেটার দিকে তাকিয়ে বলে, এটা ঐ মৌমাছির কাণ্ড নয়তো ?

—না ভেরা, ডাক্তার বলেন। তবে ওটাকে হত্যাকারী কাজে লাগিয়েছে। তার হত্যার মধ্যেও দেখছি একটা শিল্পের ছাপ রয়েছে।

—আচ্ছা ডাক্তার, এখানে আসার সময় আপনি হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ সঙ্গে এনেছিলেন।

—হ্যাঁ।

সঙ্গে সঙ্গে চার-জোড়া চোখ ডাক্তারের উপর গিয়ে পড়ে। সে তাকানোর অর্থ ডাক্তার বুঝতে পারছেন।

ডাক্তার বলেন, সব ডাক্তারের ব্যাগেই ঐ সিরিঞ্জ থাকে।

—ঠিক বলেছেন, বিচারপতি মাথা নাড়েন। কিন্তু মনে না করলে দয়া করে আপনার ব্যাগ থেকে ঐ সিরিঞ্জটা বার করে দেখাবেন ? আর এখন ওটা কি আপনার ব্যাগে আছে ?

—হ্যাঁ, আমার হাত-ব্যাগেই আছে, আর ব্যাগটা আছে আমার ঘরে, সুটকেসের মধ্যে।

—আমরা আপনার কথার সততা যাচাই করতে পারি ?

—একশো বার পারেন, ডাক্তার তাঁর কথায় বেশ জোর দিয়ে কথাটা বলেন।

—চলুন তাহলে।

—চলুন।

মিছিল করে কয়েকটি লোক ডাক্তারের নির্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করলো। তাঁর সুটকেস বার করা হলো। তারপর তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও সেই সিরিঞ্জের হদিস মিললো না।

৪

—নিশ্চয়ই কেউ চুরি করেছে। ডাক্তার কর্কশ গলায় বলে ওঠেন। এর জবাবে কেউ কোন কথা বলে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ডাক্তার আবার বলেন, আবার বলছি, কেউ চুরি করেছে।

বিচারপতি গম্ভীর গলায় বলেন, এ ঘরে আমরা পাঁচজন আছি। তাহলে এর মধ্যেই একজন হত্যাকারী। তাহলে নিরপরাধ আর চারজনকে খুব সাবধানে থাকতে হবে।

একটু থেমে বিচারপতি ফের বলেন, আচ্ছা ডাক্তার, আপনার কাছে একটা ওষুধের বাক্স আছে?

—হ্যাঁ, এই তো।

—আমার তাতে কিছু ঘুমের ওষুধ আছে। ঘুম না এলে একটা করে খাই। বেশী খাওয়া ভালো না। বলে বিচারপতি লম্বার্ডের দিকে তাকান। লম্বার্ড, তোমার কাছে একটা রিভলবার আছে, তাই না?

—হ্যাঁ, আছে। লম্বার্ড সায় জানায়। তাতে কী?

—কিচ্ছু না। আমি বলতে চাইছি, এই যে ডাক্তারের ওষুধের বাক্স, আমার ঘুমের ট্যাবলেটগুলো, তোমার রিভলবার, এই রকম আরো কারুর কাছে কিছু থাকলে, সেগুলো কোন একটা নিরাপদ জায়গায় রেখে দেওয়া উচিত। তারপর আমাদের দেহ এবং জিনিস-পত্তর দেখতে হবে।

—কিন্তু রিভলবার হাতছাড়া করলেই তো আমার বিপদ, লম্বার্ড অরাজী গলায় কথাটা বলে।

—দেখো লম্বার্ড, তুমি যুবক। তোমার গায়ে যথেষ্ট শক্তি আছে। আর ব্লোরও যথেষ্ট শক্তি ধরে। বয়সেও যুবক। আমি, ডাক্তার ও ভেরা সাধ্যমত ওকে সাহায্য করবো। কাজেই বুঝতে পারছো, এ ক্ষেত্রে বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই।

—বেশ, বলুন কী করতে হবে? লম্বার্ড অসহিষ্ণুভাবে বলে।

—এই তো বুদ্ধিমানের মত কথা। এখন বলো, তোমার রিভলবার কোথায় আছে?

—আমার খাটের পাশের টেবিলের ড্রয়ারে।

—আচ্ছা।

—আমি গিয়ে নিয়ে আসছি।

—না। তুমি একা নয়। আমরাও তোমার সঙ্গে যাবো।

—বেশ চলুন।

সকলে মিলে লম্‌বার্ডের ঘরে হাজির হলো। আবার বিস্ময়ের পর বিস্ময়! লম্‌বার্ড ড্রয়ার টেনে খোলে। ড্রয়ার ফাঁকা। তাতে রিভলবার নেই।

৫

—অবাক কাণ্ড! লম্‌বার্ড বিস্ময়ে হতবাক্!

—ভেরা, তুমি একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াও, বিচারপতি আদেশ দেন।

ভেরা বাইরে চলে যেতে লম্‌বার্ডের দেহ তল্লাশি করা হলো। তারপর একে একে বিচারপতি, ডাক্তার এবং ব্লোরও। তেমন সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেল না।

তারপর ওরা পোশাক পরে নিতে বিচারপতি ভেরাকে ডাকলেন, ভেরা, তোমায় একটা কথা বলছি কিছু মনে করো না। অন্য সময় হলে বলতাম না। কিন্তু আমি আজ নিরুপায়। তোমার কাছে সাঁতারের পোশাক আছে?

—হ্যাঁ।

—এই পোশাক বদলে তা পরে এসো।

—আচ্ছা।

ভেরা একটু পরে সাঁতারের পোশাক পরে ফিরে আসে। তা দেখে বিচারপতি বললেন, এবার তুমি এখানে দাঁড়াও। আমরা তোমার ঘর এবং জিনিসপত্র একটু পরীক্ষা করতে দেখতে চাই।

ভেরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলো। অন্য সকলে তার ঘর পরীক্ষা করে ফিরে যেতে সে সাঁতারের পোশাক ছেড়ে সাধারণ জামা-কাপড় পরে সকলের সঙ্গে যোগ দিল।

বিচারপতি এবার বললেন, একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল যে, আমাদের কারুর কাছে কোন অস্ত্র বা ওষুধপত্র নেই। এখন আমাদের প্রধান কাজ ঐ ওষুধগুলো কোন নিরাপদ জায়গায় রাখা। নিচে খাওয়ার ঘরে রুপোর বাসনগুলো একটা সিন্দুকের মধ্যে থাকে। তাতে রাখা সবচেয়ে ভালো।

—কিন্তু সিন্দুকের চাবি কার কাছে থাকবে? তারপর লম্বার্ড ব্যঙ্গের সুরে বলে। নিশ্চয়ই আপনার কাছে?

এ কথা শুনে বিচারপতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লমবার্ডের দিকে তাকালেন, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। শুধু শান্তভাবে সকলের উদ্দেশে বললেন, এবার তাহলে নিচে যাওয়া যাক্।

গেরস্তলির চাবিগুলো একটা হুকে পাশাপাশিভাবে সাজানো রয়েছে। ওয়ারগ্রেভ একটা রিং তু'লে নিলেন। তাতে দুটো চাবি। খাবার ঘরের এক কোণে সিন্দুকটা। ওটা খুলতে দুটো চাবি লাগে। সিন্দুক খুলে তার ড্রয়ারে ওষুধগুলো রেখে চাবি দিয়ে ওটা বন্ধ করলেন।

তারপর দুটো চাবি লম্বার্ড এবং ব্লোরকে দিয়ে বিচারপতি বললেন, দলের মধ্যে তোমাদের দু' জনের জোর সবচেয়ে বেশী। তাই একে অপরের কাছ থেকে চাবি কেড়ে নিতে পারবে না। আর এই সিন্দুক ভাঙা সহজ কথা নয়। তাতে অসাধারণ শক্তির প্রয়োজন। আর পারলেও ওতে দারুণ শব্দ হবে। কাজেই ওষুধগুলো থেকে আর ভয়ের কারণ থাকবে না।

একটু থেমে বিচারপতি আবার বলেন, কিন্তু আমি ভাবছি, লম্বার্ডের রিভলবারটা গেল কোথায়?

ব্লোর বলে, আমার বিশ্বাস, রিভলবারের মালিক তা খুব ভালো করেই জানে।

—বুদ্ধু কোথাকার! লম্বার্ড ঝাঁঝিয়ে ওঠে। বলছি না চুরি গেছে, চুরি গেছে। এবার বুঝলে হাঁদারাম!

—তুমি শেষবার সেটা কখন দেখেছিলে? বিচারপতি লম্বার্ড'কে জিজ্ঞেস করেন।

—কাল রাতে শোবার সময়।

—তার মানে আমরা যখন সকালে রজার্সকে দেখতে চাই সে সময় ওটা কেউ সরিয়েছে।

—সেটা এখন খুঁজে দেখলে হয় না? ভেরা বলে। এ বাড়িতেই হয়তো কোথাও লুকানো আছে।

—তাতে মনে হয় কোন কাজ হবে না। কারণ হত্যাকারী অনেক সময় পেয়েছে সেটাকে লুকিয়ে ফেলতে।

—রিভলবারটা কোথায় তা আমি বলতে পারছি না, ব্লোর বলে। তবে আর একটা জিনিস কোথায় তা আমি বলতে পারি। আসুন আপনারা আমার সঙ্গে।

ওরা ব্লোরকে অনুসরণ করে খাওয়ার ঘরের পিছনে এসে দাঁড়ায়। তারপর ব্লোর সামনের দিকে আঙুল নির্দেশ করে বলে ঐ দেখুন, জানলার কাছে ঘাসের উপর পড়ে রয়েছে সিরিঞ্জ ও একটা ভাঙা পুতুল। ওর মুখে পরিতৃপ্তির হাসি। হত্যাকারী মিস এমিলিকে হত্যা করে জানলা দিয়ে ওগুলো ফেলে দিয়েছে।

সিরিঞ্জটা ভাঙেনি। সম্ভবত ঘাসের উপর পড়েছিল বলে। কিন্তু তাতে আঙুলের কোন ছাপ পাওয়া যায়নি, তা আগে মুছে নিয়েছে।

ভেরা বলে, এবার চলুন, রিভলবারটার সন্ধান করা যাক্।

—বেশ, কিন্তু আমরা সবাই একসঙ্গে থাকবো, বিচারপতি বলেন। আলাদা ভাবে থাকা মানেই হত্যাকারীকে হত্যার সুযোগ করে দেওয়া।

এরপর সারা বাড়ি তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও রিভলবারের কোন হদিস মিললো না।

তেরো

'আমাদের মধ্যে একজন খুনী' এ কথাটা পাঁচটা মানুষ এক নাগাড়ে ভেবে চলেছে। ফলে তারা ভীত। তারা একে অপরকে সন্দেহ করতে ছাড়ছে না, সবাই সবার শত্রুতে পরিণত হয়েছে। তবু আবার নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টায় পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত।

ওয়ারগ্রেভের কেতাদুরস্ত পোশাক। শক্ত কলার। তা থেকে শীর্ণ লম্বা গলাটা বেরিয়ে এসেছে। ঘাড়টা একবার বাঁ দিকে, আর একবার ডান দিকে নড়ছে। চোখ দুটো জুল জুল করছে। তিনকাল গিয়ে যেন এককালে ঠেকেছে চিড়িয়াখানার বড় কচ্ছপটার মতন।

ব্লোর এককালে পুলিশ ইন্সপেক্টার ছিল। পোশাক চটকদার নয়। জবুথুবুর মত বসে আছে। চোখের দৃষ্টিতে যেন ধার কমে গেছে এবং চাউনিও কুৎসিত। যেন নোংরা ডোবা থেকে উঠে আসা একটা কদাকার ব্যাঙ।

দরজার কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসে আছেন ডাক্তার। হাত-গুলো তাঁর থরথর করে কাঁপছে। মাঝে মাঝে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছছেন। দৃষ্টি অশান্ত। যেন ভীত কোন প্রাণী।

এদিক দিয়ে ব্যতিক্রম লম্‌বার্ড। উজ্জ্বল চোখে সতর্কতার ছাপ। মাঝে মাঝে পা নাড়াচ্ছে। ছিপছিপে বেতের মত চেহারা। দৃঢ় কিন্তু নমনীয় ভঙ্গী। মাঝে মাঝে হাসছে। তখন ওর ঝকঝকে দাঁতের সারি দেখা যায়। ও যেন একটা প্রাণোচ্ছল চিতা বাঘ।

ভেরা শান্ত হয়ে একটা সোফায় বসে আছে। শান্ত, ক্লান্ত বিষণ্ণ ওর দৃষ্টি। চোখ দুটো ঘোলা। কিন্তু সে দৃষ্টি যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। ও যেন একটা আহত ভীরু পাখি।

বাইরে অঝরে বৃষ্টি পড়ে চলেছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে

ঝড়। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস বাড়িটায় গায়ে আছাড় খেয়ে পড়ে যেন চুরমার করে দিতে চাইছে। ওদের মনেও এলোমেলো ভাবনার ঝড় বয়ে চলেছে।

'নিশ্চয়ই এ কাজ ডাক্তারের। ডাক্তার না ছাই! পাগলা-গারদ থেকে পালিয়ে এসেছে। এখন ডাক্তার সেজে বসেছে। বলে দেবে নাকি সকলকে? কিন্তু ওরা যদি বিশ্বাস না করে? সর্বনাশ! ও আমার দিকে এমন করে তাকাছে কেন!'

'আমি? আমি কাউকে পারোয়া করি না। বিপদ? বিপদ আমার বহুদিনের পুরনো সঙ্গী। কিন্তু আমার রিভলবারটা গেল কোথায়? কে নিতে পারে?'

'পাগল হয়ে যাবে এরা। তাতে কোন সন্দেহ নেই। কোথায় যেন পড়েছিলাম, মরণ তোমার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। আর ঐ মেয়েটা সম্পর্কে সাবধান থাকতে হবে।'

'সময় কী থেমে গেছে? না, ঐ তো ঘড়িটা টিক্ টিক্ করে চলেছে। কিন্তু ওর কাঁটা সরছে তো? তবে এত আস্তে কেন!'

'না, না, না, আর উপায় নেই। ফেরবার পথ বন্ধ। শেষ পর্যন্ত যেতেই হবে এখন। তবে মাথা ঠিক রাখতে হবে। আমি স্বীকার করছি, যা হয়েছে তা না হলেই ভালো ছিল। এ সব ভাবা বৃথা। ঘটনা ঘটে গেছে। ফেরার পথ নেই...নেই...নেই। হে ঈশ্বর, তুমি একমাত্র ভরসা।'

এক সময় দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজলো। বলা বাহুল্য এটা বিকেল।

ভেরা সোফা ছেড়ে উঠে বলে, চা খাবেন কেউ ?

চায়ে কারুর কোন আপত্তি নেই।

—তাহলে আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, ভেরা এগোয়। আমি চা করে নিয়ে আসছি।

—ভেরা ! বিচারপতি ওকে ডাকলেন।

—কি, ভেরা পিছন ফিরে ওঁর দিকে তাকায়।

—চলো, আমরাও তোমার সঙ্গে যাই। মানে, চা-টা তুমি আমাদের সকলের সামনেই করো। কি বলো ? কথাটা অপ্রিয়, তাই আমতা আমতা করে বিচারপতি তাঁর বক্তব্য জানালেন।

—বেশ, চলুন, ভেরার করুণ মুখে সামান্য হাসি।

২

সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টা। দিনের আলো নিবে এলো।

লম্বার্ড উঠে ঘরের আলো জ্বালবার জন্য সুইচ টিপলো, কিন্তু আলো জ্বললো না।

—রজার্স মরে যাবার পর থেকে আর ইঞ্জিন চালানো হয়নি, ব্লোর বলে। তাই হয়তো আলো জ্বলছে না।

—চলো, ইঞ্জিনটা চালিয়ে দিয়ে আসি, লম্বাড' বলে।

—কী হবে সন্ধ্যেবেলা ঝামেলা করে ! বিচারপতি বলেন। তার চেয়ে রান্না ঘরে এক গাদা মোমবাতি আছে তাই জ্বালিয়ে দাও।

মোমবাতিই জ্বালানো হলো !

৩

ভেরা ভাবে, মাথাটা ভারি ভারি লাগছে। গা ম্যাজম্যাজ করছে। একটু স্নান করে নিলে মন্দ হবে না।

ভেরা টেবিল থেকে একটা মোমবাতি তুলে জ্বালিয়ে একটা প্লেটের উপর রাখে। তারপর সেটা নিয়ে দোতলায় নির্দিষ্ট ঘরের দিকে যেতে থাকলো। চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

সিঁড়ি, দোতলা, বারান্দা, ঘর, বাথরুম ইত্যাদি সব অন্ধকারের মাঝে যেন হারিয়ে গেছে। একটা মোমবাতির সামান্য আলোয় চারদিকে কালো কালো ছাড়া পড়েছে।

ওর ঘরে যেন একটা সমুদ্রের গন্ধ খেলা করছে। কে ও? কে? হুগো? কী ভাবছে ভেরা? ও এভাবে কাঁপছে কেন? যা, হাত থেকে ওর প্লেটটা পড়ে গেল। বাতিটাও নিবলো। আর ঠিক তখনই একটা ঠাণ্ডা হাত ওর কপালে, মুখে, গালে, গলায়...।

ভেরা চিৎকার করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে।

৪

ভেরার চিৎকার শুনে সবাই ছুটে আসে। প্রত্যেকের হাতে একটা করে মোমবাতি।

ডাক্তার পরীক্ষা করলেন ভেরাকে। তারপর আনন্দের সঙ্গে জানালেন, ভেরা বেঁচে আছে। ঈশ্বরকে অজস্র ধন্যবাদ।

ব্লোর দৌড়ে গিয়ে নিচে থেকে গ্লাসে করে একটু ব্র্যাণ্ডি নিয়ে আসে।

ভেরা কিছুটা কাহিল হয়ে পড়েছে। যখন সে বুঝতে পারলো, তাকে কিছু খাওনোর চেষ্টা চলছে তখন সে সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, না! না! আমি কিছু খাবো না। সে এক ঝট্‌কায় ব্লোরের হাত সরিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

এতে ব্লোর চরম অপমান বোধ করলো।

এদিকে খুশী হলো কিন্তু লম্বার্ড। সে বললো, এটা একটা আশার কথা যে, এত কাণ্ডের পরও আপনি মাথা ঠিক রাখতে পেরেছেন। আপনি বিচার শক্তি হারিয়ে ফেলেন নি। যাক্, দেখি একটা না-খোলা বোতল পাই কি না!

তারপর ডাক্তার আস্তে আস্তে ভেরাকে তুলে ধরলেন। এমন ভাবে ধরলেন যাতে ওর কোন রকম না লাগে। এরপর ওকে নিয়ে গেলেন কলের কাছে।

ভেরা চোখে মুখে জল দিল। তারপর ডাক্তার ওর সামনে একটা গ্লাস ধুয়ে ওকে জল দিলেন। ও জলটুকু খেলো। এরপর ওকে খাটে বসতে সাহায্য করলেন তিনি।

ভেরার ভয়ের কারণ বোঝা গেল। ওর ঘরের সিলিং থেকে ঝুলছে একটা সামুদ্রিক লতা। কিন্তু ওটা ওখানে কে ঝুলিয়ে রাখলো ?

ইতিমধ্যে লম্বার্ড একটা না-খোলা ব্র্যাণ্ডির বোতল নিয়ে এলো। তা থেকে একটু ব্র্যাণ্ডি পান করে ভেরা সুস্থ বোধ করলো। এবং ওর চোখ মুখের রং স্বাভাবিক হলো।

লম্বার্ড খুশী খুশী গলায় বলে, ভেরা দেবী খুনীর প্ল্যান বানচাল করে দিয়েছেন। খুনী ভেবেছিল, ভয় পাইয়েই কাজ হাসিল করবে। সত্যি, বলতে হবে আপনার মনে বেশ জোর আছে।

তারপর লম্বার্ড ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বলে, তা ডাক্তার, আপনি কি বলেন ?

ডাক্তার এর কোন জবাব দিলেন না। তবে অন্য একটা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ব্লোর যে গ্লাসে করে ব্র্যাণ্ডি এনেছে, সেটা পরীক্ষা করতে থাকেন। তাঁকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছে।

ব্লোর বললো, ডাক্তার! আমি আপনার মাতলব বুঝতে পারছি। আপনি আমায় সন্দেহ করছেন। ঐ গ্লাসে আমি...।

ভেরা প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্য বললো, সকলকে দেখছি, কিন্তু বিচারপতিকে তো দেখতে পাচ্ছি না! তিনি কোথায় গেলেন ?

—আরে! সত্যিই তো, ডাক্তার বললেন। আমরা ভেবেছি উনি আমাদের সঙ্গেই আছেন।

চারজনে মিলে খুঁজতে শুরু করলো। চিৎকার করে ডাকলেন ডাক্তার, ওয়ারগ্রেভ!

খাওয়ার ঘর, বারান্দা, বসবার ঘর, সিঁড়ি ইত্যাদি কোথাও বাদ দেওয়া হলো না। তবু ওয়ারগ্রেভের কোন খোঁজ মিললো না। এরপর সবাই তাঁর ঘরে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো।

একটা বড় চেয়ারে বিচারপতি বসে আছেন। মাথায় জজের

পরচুলা, পরনে লাল রঙের গাউন। আর দু'পায়ে দুটো মোমবাতি।

ডাক্তার এগিয়ে গিয়ে ওঁকে পরীক্ষা করলেন। তিনি বেঁচে নেই। তারপর মাথা থেকে সরালেন পরচুলাটা। তখনই তাঁর মৃত্যুর কারণটা বোঝা গেল। চকচকে টাকের মাঝখানে একটা লাল দাগ। অর্থাৎ তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ডাক্তার তাই জানালেন।

ভেরা পরচুলাটা কুড়িয়ে নিয়ে বললো, এ যে এমিলির হারিয়ে যাওয়া উলের গোলা দিয়ে তৈরি। আর গাউনটা হারিয়ে যাওয়া পর্দার লাল সিল্কের কাপড়।

—এবার বুঝতে পারছি, ব্লোর বলে, রিভলবারটা কেন সরানো হয়েছে।

—মানতেই হবে হত্যাকারীর রসবোধ আছে, লম্বার্ড বলে। বিচারপতিকে কেমন সুন্দর করে সে সাজিয়েছে। আর এই দৃশ্য দেখে হয়তো সেটনের আত্মা শান্তি পাচ্ছে।

—ছিঃ, একথা বলতে আপনার লজ্জা করছে না! ভেরা লম্বার্ডকে ধমকায়। এটা কী ব্যঙ্গের সময়। আর আপনি কাল বলছিলেন না যে, ওয়ারগ্রেভকে আমার সন্দেহ হয়!

—হ্যাঁ, আমি বলেছিলাম, এবার লম্বার্ড গম্ভীর হয়। আমার বুদ্ধির উপর আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। যাক্, আমাদের মধ্যে থেকে একজনের উপর সন্দেহ কমলো। অবশ্য সেটা একটু দেরিতে ঘটলো, এই যা।

চোদ্দ

নিচের বসবার ঘরে সবাই নেমে এলো। সবাই বলতে ওরা চারজন—ডাক্তার, ভেরা, ব্লোর এবং লম্বার্ড।

—এখন কি করা যায়? ব্লোর ওদের দিকে তাকায়।

—পেটে তো কিছু দিতে হয়, লম্বার্ড বলে। পেট তো সে কথা মানবে না। সত্যি কথা বলে সে।

টিনের কিছু খাবার দিয়ে রাতের খাওয়া কোন রকমে সারা হলো। মানে খাওয়ার জন্য কিছু খাওয়া এই আর কী! এ খাবারের কোন স্বাদ বা তৃপ্তি কারুর হলো না।

—টিনের খাবারে আমার একবারে অরুচি ধরে গেল, ভেরা মুখ বিকৃতি করে বলে। যদি বেঁচে ফিরি তাহলে কখনো এ খাবার আর মুখে তুলবো না।

—এরপর কার পালা কে জানে। ব্লোর কথাটা বলে বসে। আসলে ও কিছুটা ভয় পেয়ে গেছে।

—ছি, ছি, একথা কেন বলছেন। ডাক্তার চমকে ওঠে। আমাদের বেশ সাবধানের সঙ্গে চলতে হবে। সতর্ক থাকতে হবে।

—থামুন মশাই। লম্বার্ড ডাক্তারের উপরে খেঁকিয়ে ওঠে। ও কথা তো বিচারপতি পই পই করে বলেছিলেন! তাতে লাভ হলো কী! নিজেও কী এ পরিণতি থেকে রেহাই পেলেন! ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! সুতরাং যার যা হবার তা হবেই।

—সত্যি, বাপারটা যে কী করে ঘটে গেল! ডাক্তার বিস্ময় প্রকাশ করেন। আমি এখনো এর মাথা-মুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না।

—এর মধ্যে আশ্চর্য হবার তো কিছু নেই, লম্বাড´ বলে। ভেরা দেবীর ঘরে ঐ কাণ্ড ঘটার পর আমরা তেড়েফুঁড়ে ওর ঘরে গেলাম এবং ওকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত হয়ে রইলাম। হত্যাকারী কখনো এ লোভনীয় সুযোগ ছাড়ে! সেই ফাঁকে সে নিশ্চিন্ত মনে কাজ সেরে উধাও হয়।

—কথাটা অস্বীকার করছি না, ব্লোর বলে। কিন্তু গুলির শব্দ তো আদৌ শুনতে পেলাম না।

—গুলির শব্দ পাবো কী করে! লম্বাড´ বলে। একদিকে ভেরা দেবীর আর্তনাদ, অন্যদিকে আমাদের দৌড়াদৌড়ির শব্দ। তার উপর সমুদ্রের গর্জন রয়েছে। এসব মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে।

এরপর কেউ কোন কথা বললো না। তারপর ভেরা বলে, এ

ভাবে বসে থেকে লাভ কী! তার চেয়ে শুয়ে পড়া ভালো। যদিও ঘুম আসবে না এ কথা ঠিকই।

সকলে যেন এই কথাটার প্রতীক্ষায় ছিল। তবু মুখ ফুটে কেউ কথাটা বলতে পারছিল না।

কেউ বলে, ঠিক কথা।

আর একজন বলে, হ্যাঁ, সেই ভালো।

অন্য একজন বলে, আমিও তাই বলছিলাম।

চওড়া সিঁড়ি। পাশাপাশি চারজনে উঠছে। কেউ কারু পিছনে বা সামনে যেতে রাজি নয়। একে অপরকে সন্দেহের চোখে দেখছে। সে এক করুণ দৃশ্য।

দোতলা। সবাই নির্দিষ্ট ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকের হাতে একটা করে মোমবাতি। তারপর সবাই একসঙ্গে কোন এক অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে যে যার ঘরে ঢুকে পড়লো। এরপর চারটে দরজা একই সঙ্গে বন্ধ হবার শব্দ শোনা গেল।

২

দরজা বন্ধ করে স্বস্তি বোধ করলো লম্‌বার্ড। তারপর সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে তাকায়। সে মুখে কোন ভয়ের চিহ্ন নেই।

নিজেই নিজের মনে নিঃশব্দে হাসলো লম্‌বার্ড। এ হাসির মধ্যে কোন কৃত্রিমতার ছাপ নেই। একবারে প্রাণখোলা হাসি। হাসতে ওর দাঁতগুলো ঝকঝক করে উঠলো।

তারপর শোবার পোশাক পরে লম্‌বার্ড শুয়ে পড়লো। এরপর হাতের ঘড়িটা টেবিলের উপর রেখে কি খেয়াল হতে সে ড্রয়ারটা টান দিয়ে খোলে। এবং যা আদৌ দেখতে পাবে না বলে আশা করেছিল, তাই সে দেখতে পেলো। দেখলো, ড্রয়ারের মধ্যে রিভলবারটা রয়েছে।

৩

ভেরা বিছানায় শুয়ে আছে। তার চোখে ঘুম নেই। কিছুতেই যেন সে দু'চোখের পাতা এক করতে পারছে না।

পাশে একটা টিপয়ের উপর মোমবাতি জ্বলছে। প্রথমটা ভেরা নিবিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। অন্ধকারকে আজ সে বড় ভয় করছে।

ভেরা নিজের মনে কথা বলতে থাকে। বলে, এভাবে ভয় পাবার কোন মানে হয় না। সে না সাহসী মেয়ে! আর ভয়টা কিসের! রাতটা নিশ্চিন্তে ঘুমনো যেতে পারে। এবং দরজা তো বন্ধ। সুতরাং ভয়ের কোন প্রশ্ন আসতে পারে না।

তারপর ভেরা ভাবে, এই ঘরে সে থাকবে—একদিন, দু'দিন, তিনদিন। যতদিন না কোন রকম সাহায্য আসে। আর হোক না ঘরটা ছোট। তবু তো নিরাপদ ঘর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখানেই সে থাকবে।

পরমুহূর্তে ভেরা ভাবে, সে কী এখানে একা থাকতে পারবে। আর একলা সে কোথায়! তার সর্বক্ষণের সঙ্গী তো একজন আছে। সে হলো হুগো। হুগোর চিন্তায় সে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

হুগো... হুগো..., হাজার বার ভেরা ওর নামটা ধরে উচ্চারণ করে। তারপর কাঁদলো। একটা যন্ত্রণায় সে ছটফট করতে থাকে।

৪

ঘুম নেই পুলিশ ইন্সপেক্টার ব্লোর চোখেও। সে ভাবছে, এবার কার পালা? নিশ্চয়ই তার নয়। কিন্তু সেই রিভলবারটা কোথায় গেল?

নিচের ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত বারোটা ঘোষণা করলো।

বিছানায় শোবার আগে ব্লোর পোশাক বদলে নেয়নি। সাধারণ পোশাক পরেই সে শুয়েছে। আর সত্যি কথা বলতে কি, পোশাক বদল করার কথা তার আদৌ মনে হয়নি।

ঘরে মোমবাতি জ্বলছে। তারপর দেশালাইটা বালিশের তলায়

রেখে সে মোমবাতিটা নিবিয়ে দেয়।

অন্ধকার হতেই ব্লোর আরো বেশী করে চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ভাবে, এই দ্বীপে যে মানুষগুলো আজ আর বেঁচে নেই তাদের কথা।

হঠাৎ ব্লোরের ল্যাণ্ডরের কথা মনে পড়ে। গ্রামোফোন রেকর্ডে এই ল্যাণ্ডরের কথা বলেছে। ওর স্ত্রী ছিল। তাকে সে দেখেও ছিল। রোগা চেহারায় এক রাশ বেদনার ছাপ এবং মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে। ওদের একটা দশ বছরের মেয়ে ছিল। কী হলো ওদের ?

তলার ঘড়িতে একটা ঘণ্টা পড়লো।

তারপর ব্লোর চমকে ওঠে। কার পায়ের শব্দ সে শুনতে পায়। বারান্দায় কে যেন হাঁটছে। হ্যাঁ, সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। ব্লোরের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে। সে আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে দরজায় কান পাতে। কিন্তু আর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

ব্লোর ভাবে, কিন্তু এখন কী করা যায় ? সে বাইরে যাবে ? কিন্তু হত্যাকারী হয়তো বাইরে তারই জন্য অপেক্ষা করছে। না, না, বাইরে যাওয়া মানে বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়।

ব্লোরের মনে হয়, কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে। নরকের বন্দীশালা থেকে মুক্তি পেয়ে কতগুলো অতৃপ্ত আত্মা যেন চুপিসারে কথা বলছে। আবার ভাবে, এসব ঘুম না হবার জন্য উত্তপ্ত মস্তিকের চিন্তা।

ব্লোর ভাবে, সবটাই হয়তো তার কল্পনা নয়। আবার সেই পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। একজনের নয় দু'জনের, কে যেন কার সঙ্গে চুপি-চুপি কথা বলছে। ওরা তার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। তারপর আবার চলতে থাকে। হ্যাঁ, বারান্দার দিক থেকে আসছে। এরপর ওরা এক তলার সিঁড়ির দিকে নামতে থাকে। আর ওদের গলা শোনা যায় না।

ব্লোর ঠিক করে নেয় কি করবে। দেশলাইটা বালিশের তলা থেকে বার করে পকেটে নিয়ে টেবিল-ল্যাম্পের বাল্ব আর শেডটা

খুলে রাখলো। এরপর সুইচ বোর্ডের প্লাগটা তুলে নিল। এবং ভারি ধাতুর ল্যাম্প স্টাণ্ডটা হাতিয়ার হিসেবে মন্দ নয়।

ব্লোরের পায়ে মোজা। চটি জোড়া খুলে রাখলো। পাছে কোন শব্দ হয়। তারপর পা টিপে টিপে বারান্দায় বেরিয়ে আসে।

বাতাস বইছে না। মেঘ কেটে গেছে। চাঁদের হালকা আলো সারা আকাশে।

সেই আলোয় ব্লোর দেখতে পায়, একটা ছায়ামূর্তি যেন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। ওকে ধরবার জন্য সে দৌড়োতে যাচ্ছিল। কিন্তু দৌড়লো না। আর একটু হলে সে হয়তো হত্যাকারীর ফাঁদে ধরা দিত।

এরপর ব্লোর ভাবে, এ ক্ষেত্রে হত্যাকারী নিজেই ধরা পড়ার ফাঁদ তৈরি করলো। চারজনের মধ্যে যে ঘরে নেই সেই হবে হত্যাকারী। এখন দেখতে হবে কে ঘরে নেই।

ব্লোর প্রথমে গিয়ে ডাক্তারের ঘরে টোকা দেয়। কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

এরপর ব্লোর লম্বার্ডের দরজায় মৃদু আঘাত করে।

—কে? সঙ্গে সঙ্গে লম্বার্ড সাড়া দেয়।

—আমি ব্লোর।

—বলো, কী ব্যাপার?

—আমার মনে হচ্ছে, ডাক্তার তাঁর ঘরে নেই।

—একটু অপেক্ষা করো। আমি আসছি!

তারপর ব্লোর ভেরার দরজায় গিয়ে টোকা দেয়।

—কে? কে? ভেরা চমকে ওঠে।

—ঠিক আছে, ভেরা দেবী। এক মিনিট। পরে আসছি।

আবার ব্লোর লম্বার্ডের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। দরজা খুলে দেয় লম্বার্ড। পরনে তার রাতের পোশাক। হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি আর একটা হাত জ্যাকেটের পকেটে। সে একটু ঝাঁঝালো গলায় বলে, এত রাতে হল্লা করে বেড়াচ্ছো কেন?

—আমার কথা সব শোন, তাহলেই সব বুঝতে পারবে, বলে ব্লোর লম্‌বার্ড'কে সব জানায়।

—আচ্ছা, তাহলে এ কীর্তি ডাক্তারের, লম্‌বার্ড' বলে। তবে ব্লোর, তোমার কথা আমি যাচাই করে নিতে চাই। চলো দেখি।

লম্‌বার্ড' ডাক্তারের ঘরে টোকা দেয়, ডাক্তার!

কোন সাড়া নেই।

—ডাক্তার। আর একটু জোরে ডাকে লম্‌বার্ড'।

কোন সাড়া নেই।

এবার দরজায় জোরে ধাক্কা দেয় লম্‌বার্ড'।

দরজা খুলে গেল।

ঘর ফাঁকা। ঘরে কেউ নেই।

ব্লোরকে সঙ্গে করে লম্‌বার্ড' ভেরার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়, ভেরা দেবী, আমি লম্‌বার্ড' কথা বলছি।

—আপনার গলা আমার পরিচিত, ভেরা দরজা না খুলে বলে। বলুন কী বলবেন।

—আমরা ডাক্তারকে খুঁজতে যাচ্ছি। তিনি ঘরে নেই। যাই ঘটুক না কেন, আপনি দরজা খুলবেন না। বুঝেছেন?

—হ্যাঁ বুঝেছি।

—যদি ডাক্তার এসে বলে, আমি ও ব্লোর মারা গেছি তবুও আপনি দরজা খুলবেন না।

—তাই হবে।

—যদি আমি ও ব্লোর এক সঙ্গে এসে আপনাকে ডাকি তাহলেই আপনি দরজা খুলবেন।

—ঠিক আছে।

—চলো ব্লোর, এবার ডাক্তারের সন্ধানে যাও যাক্, লম্‌বার্ড' ওকে আহ্বান জানায়।

—কিন্তু আমি একটা কথা ভাবছিলাম।

—কি কথা ?

—আমাদের যথেষ্ট সাবধান হতে হবে।

—কেন ?

—রিভলবারটা ডাক্তারের কাছে নিশ্চয়ই রয়েছে।

—না, ওটা আমার কাছে আছে, বলে লম্‌বার্ড দেখায়। রাতে শুতে যাবার আগে পেয়েছি।

থমকে দাঁড়ায় ব্লোর।

তা দেখে লম্‌বার্ড বলে, ভয় নেই তোমায় আমি গুলি করবো না। সঙ্গে আসতে না চাও তো ঘরে গিয়ে দোর দিয়ে বসে থাকো গিয়ে। আমি একাই চললাম।

ব্লোর লম্বার্ডের সঙ্গে গেল। মনে মনে সে বলে ওঠে, রিভলবারকে আমি ভয় করি না। আমার ভয় রহস্যকে, গুপ্তঘাতককে এবং এই ধরনের ভূতুড়ে ব্যাপারকে।

৫

ঘুমের আর কোন সম্ভাবনা নেই। বিছানায় ভেরা উঠে বসে থাকে। তারপর অপেক্ষা করতে থাকে কখন লম্বার্ড আর ব্লোর ফিরে আসবে।

এরপর হঠাৎ কি মনে হতে ভেরা দরজাটা দেখে নেয়। এই দরজা ভেঙে ঢোকা সম্ভব নয়। আর ডাক্তার যদি হত্যাকারী হন তবে গায়ের জোরে হয়তো কিছু করতে চাইবেন না। কিন্তু বুদ্ধিতে ? হ্যাঁ, তা অবশ্য তাঁর পক্ষে সম্ভব হতে পারে।

ভেরা আবার ভাবে, বুদ্ধির জোরে কি ডাক্তার দরজা খুলতে পারেন ? হ্যাঁ, সে উপায় তো একটু আগেই লম্বার্ড বলে গেল। ডাক্তার এসে হয়তো বলতে পারেন, লম্বার্ড এবং ব্লোর দু'জনেই মারা গেছে। তাতেও সে যদি দরজা খুলতে রাজি না হয় তখন হয়তো ডাক্তার বলবেন, তিনি সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়েছেন। বলে হয়তো কাতরাতে শুরু করে দেবেন। তাতেও সে দরজা খুলবে না।

তখন যদি বলেন, বাড়িতে আগুন লেগেছে। তিনি যদি পেট্রল দিয়ে তাঁর ঘরের সামনে আগুন লাগিয়ে দেন, তাহলে সে দরজা দিয়ে লাফিয়ে নিচে পড়বে। ঠিক তলায়ই একটা ফ্লাওয়ার বেড রয়েছে। আর সে না একজন নামকরা স্পোর্টসম্যান! সুতরাং ভয় কী! মনের সাহস হারালে চলবে না।

এবার ভেরা জানলার কাছে এসে দাঁড়ায়। চোখে মুখে ঠাণ্ডা বাতাসের পরশ লাগে। ভাবে, ভোর হতে আর বেশী দেরি নেই।

৬

দরজায় টোকা দেয়।

—কে? ভেরা সঙ্গে সঙ্গে জানতে চায়।

—আমি ব্লোর।

আর একজনের গলাও শোনা যায়, আমি লম্বার্ড।

ভেরা দরজা খুলে দিল। দরজার বাইরে ওরা দু'জনে দাঁড়িয়ে আছে। পাজামা হাঁটু পর্যন্ত জলে ভেজা। দু'জনের চেহারাই উস্কো-খুস্কো। এবং দু'জনকেই বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

—কী ব্যাপার? ভেরা জানতে চায়।

—ব্যাপার সাংঘাতিক, ব্লোর হাঁপাতে হাঁপতে বলে।

—খবরটা কী?

—ডাক্তারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

—কী যা-তা সব বকছেন?

—ঠিকই বলছি।

—সব জায়গা দেখেছেন?

—হ্যাঁ, সারাটা দ্বীপ আমরা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি।

—অন্ধকার তো ছিল।

—প্রথমে চাঁদের আলোয়, পরে ভোরের। কিন্তু তাঁকে কোথাও খুঁজে পেলাম না।

—কিন্তু এমন ও তো হতে পারে যে, তাঁকে আপনারা বাইরে

খুঁজছেন, তিনি হয়তো বাড়ির মধ্যেই কোথাও গা ঢাকা দিয়ে বসে আছেন।

—তাও আমরা বাদ দেইনি।

এতক্ষণ লম্বার্ড চুপ করে ছিল। সে এবার কথা বলে, আরো একটা খবর আছে।

—কী ? ভেরা কিছুটা অসহায়।

ভেরার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, আমরা দেখে এলাম...।

—কী দেখে এলেন ?

—পুতুল ক'টা আছে জানেন ?

—উঁহু, ভেরা এবার ভয় পেয়ে যায়।

—মাত্র তিনটে।

—তিনটে ?

—হ্যাঁ।

—মানে, আমরা এই তিনজন মাত্র এখন বেঁচে আছি ?

—হ্যাঁ, এর মানে তো তাই বোঝাচ্ছে।

—ভেরার মুখ দিয়ে একটা আর্তনাদের মতো শব্দ শোনা যায়। তারপর সে যেন বোবা হয়ে গেল।

পনেরো

সোনালী রোদে চারদিক যেন ভেসে যাচ্ছে। গত কয়েকদিনের আবহাওয়ার সঙ্গে আজ কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ঝড় থেমে গেছে। সেই সঙ্গে মেঘও। আর আবহওয়া বদলাবার দরুন সকলের মেজাজ পাল্টেছে।

ওরা তিনজনের সমুদ্রের ধারে বসে আছে। ওরা বলতে ভেরা, লম্বার্ড এবং ব্লোর। ওদের দেখে মনে হচ্ছে, একটু আগে ওরা যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখে সবে মাত্র জেগে উঠেছে। হ্যাঁ, ওদের বিপদ আছে। তা সত্ত্বেও ওরা যেন এখন সে চিন্তা থেকে ভারমুক্ত।

—এখনে থেকে আজ কোন রকমে সংকেত পাঠাতেই হবে, লম্বার্ড বলে। দিনের বেলায় এ জায়গা থেকে আয়না ফেলবো। তাতেও কিছু না হলে রাতে আগুন জ্বালবো।

—ঠিক বলেছেন, ভেরা ওর কথায় সায় জানায়। তা দেখতে পেয়ে তীর থেকে নৌকো নিশ্চয়ই আসবে আমাদের সাহায্যের জন্যে। ভাববে, আমরা বিপদে পড়েছি।

—তাতেও অসুবিধে আছে।

—কী?

—দেখছেন না সমুদ্র কেমন অশান্ত। নৌকো ভিড়বে কি করে! আগামী কালের আগে কিছু করা সম্ভব হবে না।

—আগামী কাল? ভেরা শিউরে ওঠে।

—হ্যাঁ।

—তার মানে আরো একটা রাত এখানে কাটাতে হবে?

—এ ছাড়া, আর তো কোন উপায় দেখছি না, লম্বার্ড একটু হাসলো। এ মুহূর্তে ওর হাসি বড় করুণ দেখায়। আর এই চব্বিশ ঘণ্টা ভালোয় ভালোয় কাটলে এ যাত্রা হয়তো আমরা উদ্ধার পেয়ে যেতে পারি।

—কিন্তু আমি ভাবছি একটা কথা, ব্লোর বলে।

—কি কথা? ভেরা জানতে চায়।

—ডাক্তারের কী হলো?

—মারা গেছে আর কী! লম্বার্ড বলে। চির মুক্তির স্বাদ পেয়েছেন তিনি। এবং বেঁচেছেন এই অহরহ মৃত্যু যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পেয়ে।

—তা নয় বুঝলাম, কিন্তু তিনি যে মারা গেছেন তার তো একটা প্রমাণ চাই।

—প্রমাণ?

—হ্যাঁ।

—একটা পুতুল উধাও।

—তা অবশ্য ঠিক, যেটা অন্যদের ক্ষেত্রেও হয়েছে। কিন্তু তাঁর মৃতদেহটা তো উবে যেতে পারে না।

—পারে।

—কেমন করে?

—যদি তাঁকে মেরে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। তিনি ভাসতে ভাসতে অনেক দূরে চলে যেতে পারেন।

—কিন্তু তাঁকে হত্যা করে কে ফেলে দিয়েছে? লম্বার্ড উত্তেজিত ভাবে ব্লোরের দিকে, তুমি না আমি? ওঁর পায়ের শব্দ পেয়ে তুমি আমায় ডাকলে। আমি তোমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। তাই আমি কখন সময় পেলাম, ওঁকে হত্যা করে সমুদ্রে ফেলে দিতে। আর ওঁর দেহটাও তো আমায় কাঁধে করে নিয়ে যেতে হয়েছে। সুতরাং অনেক সময়ের দরকার।

—তা আমি জানি না।

—জানো না?

—না। তবে একটা কথা আমি জানি।

—কী কথা?

—সেই রিভলবারের কথা।

—ওর মধ্যে আবার কী কথা থাকতে পারে?

—ওটা সব সময়ই তোমার কাছে ছিল।

—বাজে কথা।

—মোটেই না।

—তোমরা আমায় তল্লাশি নেওনি?

—নিয়েছিলাম।

—তাহলে?

—সেটা তখন হয়তো কোথাও লুকিয়ে রেখেছিলে।

—আমার ঘরও সার্চ করা হয়েছিল।

—তার মধ্যেও তোমার নিশ্চয়ই কোন কারসাজি ছিল।

—ছিল না, লম্বার্ড চেঁচিয়ে বলে। কালকের মত আজও বলছি,

ওটা কাল রাতে আমার ড্রয়ারের মধ্যেই আবার পেয়েছি।

—এসব ছেলে-ভুলনো গল্প আমায় বলবে না।

—ওটা গল্প নয়।

—ঠিক আছে, তোমার কথাই নয় মেনে নিলাম। কিন্তু কে ফেরত দিল, কি ভাবে ফেরত দিল, কখন ফেরত পেলে, তা নিশ্চয়ই তুমি জানো না?

—না।

—এখন ওটা তোমার কাছেই আছে?

—হ্যাঁ।

—তাহলে এখন এটার একটাই অর্থ।

—কী?

—এখন আমি আর ভেরা দেবী তোমার করুণার পাত্র। মানে তোমার দয়ার উপর আমাদের বাঁচা মরা অনেকটা নির্ভর করছে, তাই না লম্‌বার্ড? তবে...।

—তবে কী?

—যদি একটা কাজ করো।

—কী কাজ?

—ঐ ওষুধগুলো যেখানে আছে রিভলবারটা ওখানে রেখে দাও এবং তার একটা চাবি আমার কাছে। অন্যটা তোমার কাছে রাখো।

—অসম্ভব! লম্‌বার্ডের স্পষ্ট জবাব।

—অসম্ভব? ব্লোর একটু ঝুঁকে লম্‌বার্ডের দিকে তাকায়। কেন?

—মানে বলতে চাইছো, আমিই আওয়েন, তাই না? তাই যদি হবে তাহলে কাল রাতে তোমায় খতম করে দিতে পারতাম। আর সে সুযোগ কী ছিল না?

—তা করোনি কেন তা তুমিই জানো।

—আপনারা দু'জনে কেন মিছিমিছি এভাবে ঝগড়া করে চলেছেন! ভেরা ওদের থামায়। এদিকে আমাদের মাথার উপর বিপদের খাঁড়া ঝুলছে। কোথায় তা থেকে রেহাই পাবার উপায় ঠিক

করবেন। তা নয় শুধু তখন থেকে ঝগড়া করে চলেছেন।

তারপর গলার সুর একটু নরম করে ভেরা বলে, আর আমার একটা কথা মনে হচ্ছে কি জানেন!

—কী কথা? লম্‌বাড´ জানতে চায়।

—ডাক্তারের ব্যাপারে।

—কথাটা কী বলুন।

—আমার মনে হচ্ছে, উনি মারা যাননি। হয়তো কোথাও গা ঢাকা দিয়ে পড়ে আছেন।

—তা সম্ভব নয়। আমরা সারা দ্বীপ খুব ভালো ভাবে খুঁজেছি।

—রিভলবারটা তো একবার হারিয়েছিল। পরে আবার সেটা পেলেন কী করে?

—রিভলবারের সঙ্গে মানুষের তুলনা করা কখনোই উচিত নয়। ওটা যেখানে সেখানে লুকিয়ে রাখা যায়, কিন্তু একটা মানুষকে তা কখনোই সম্ভব নয়।

—কিন্তু আমার ধারণা, ডাক্তার কোথাও লুকিয়ে আছে। আর আড়ালে থেকে তাঁর পাগলামো চালিয়ে যাচ্ছেন।

২

হাত-ঘড়ির দিকে তাকায় ব্লোর। এখন বেলা দুটো। সে বলে, এখন লাঞ্চের কি হবে?

—আমি আর ও বাড়িতে যাচ্ছি না, ভেরার সাফ জবাব।

—যাবেন না?

—না।

—কিন্তু কিছু খাওয়া তো দরকার।

—টিন ফুড তো রয়েছে। তারপরই ভেরা মুখ বিকৃতি করে বলে। ঐ খাবার দেখলে আমার গা বমি বমি করে।

তারপর ভেরার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ব্লোর লম্বার্ডের দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি কী বলো?

—আমার আপাতত কোন ক্ষিদে নেই। আমি এখানেই থাকবো

—কিন্তু…।

ব্লোর ভেরাকে একটা কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু লম্‌বার্ডের দিকে তাকিয়ে সে চুপ করে যায়।

ভেরা ওর কথাটা অনুমান করে হেসে বলে, আপনার অনুপস্থিতিতে মিঃ লম্‌বার্ড আমায় গুলি করবেন না বলেই আমার একান্ত বিশ্বাস।

—ওকথা আমি বলতে চাইনি।

—তবে কি কথা বলতে চেয়েছেন ?

—আমরা সব সময়ে একসঙ্গে থাকবো বলে আমাদের মধ্যে এই রকম একটা কথা হয়েছিল। আমি সেই কথাটাই ওকে মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, আর কী!

—তুমি একাই মৃত্যুপুরীতে যেতে চাইছো ? লম্‌বার্ড বলে, ঠিক আছে, চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

—না, থাক্, তুমি এখানেই থাকো।

—আসলে তুমি এখনো আমায় বিশ্বাস করতে পারছো না। আমি কি তোমাদের দু'জনকে খুন করতে পারি না ?

—না পারো না, ব্লোর বলে।

—কেন ?

—তোমার তো একটা প্ল্যান থাকবে।

—অনেক কিছুই তুমি জানো দেখছি!

—তবে একা ঐ বাড়িতে যাওয়া একটু বিপজ্জনক বই কী! বলে ব্লোর ইতস্তত করতে থাকে।

—তাই বলে ভেবো না, রিভালবারটা আমি তোমায় দেবো। লম্‌বার্ডের গলা এ মুহূর্তে কঠোর শোনালো।

—তা আমি চাই না! বলে ব্লোর বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

—উনি একটা ঝুঁকি নিলেন, তাই না ? ভেরা ভয়ে ভয়ে কথাটা লম্‌বার্ডকে বলে!

—না।

—কেন ?

—ওর গায়ে দারুণ জোর আছে। ডাক্তার ওর সঙ্গে গায়ের জোরে কিছুতেই পারবে না।

—তবু…।

—ব্লোর খুব হুঁশিয়ার। তাছাড়া, ডাক্তার তো ও বাড়িতে নেই।

—তাহালে এ সমস্যার সমাধান কী ? ভেরা বললো।

—সমাধান ?

—হ্যাঁ।

—ব্যাপারটা একটু তলিয়ে ভাবুন। ব্লোর গত কাল রাতে যা বলেছেন তা তো শুনেছেন ?

—হুঁ।

—ওর কথা যদি সত্যি হয় তাহলে ডাক্তারের ব্যাপারের সঙ্গে আমার কোন যোগ নেই এবং আমি নিজেকে নিঃসন্দেহের তালিকায় রাখতে পারি। ও ওর ঘরের সামনে প্রথম পায়ের শব্দ পেয়েছে, পেয়ে অনুসরণ করে ডাক্তারকে হত্যা করে তারপর আমাকে ডেকেছে।

—কেমন করে ? ভেরা জানতে চায়।

—তা আমি জানি না, ওর সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। ও পুলিশে চাকরি করতো বলে যা বলেছে, সেটা একটা ধাপ্পা ছাড়া আর কিছুই নয় বলে আমার মনে হচ্ছে।

—ও যদি এখন আমাদের কিছু করে বসে ? ভেরা ভয় পেয়ে কাঁপা গলায় কথা বলে, তাহলে আমাদের কী হবে ?

—কী হবে ?

—হ্যাঁ।

—এটা দেখেছেন ? লম্বার্ড পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে ভেরাকে দেখায়। মনে রাখবেন এটা আমার সঙ্গে রয়েছে।

ওদিকে রিভলবারটাকে দেখে ভেরার মন কেঁপে ওঠে, ভাবে, এ দিয়ে ও তো আমায় চিরতরের জন্য নিস্তব্ধ করে দিতে পারে। হ্যাঁ, পারে বই কী! ওর মনে কী আছে তা কী করে বুঝবে! আর ও এ

মুহূর্তে আমার সঙ্গেই বা রয়েছে কেন! আমি তো ওকে আমার কাছে থাকবার জন্য একবারও অনুরোধ করিনি! তবে?

লম্বার্ড ভেরার মনোভাব বুঝতে পেরে হেসে বলে, ভেরা দেবী, আমার দ্বারা আপনার কোন ক্ষতি হবে না। আপনি আমার উপর এটুকু বিশ্বাস করতে পারেন।

—বিশ্বাস না করে উপায় কী! ভেরা এখন কিছুটা স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করছে। তবে আমার ধারণা, ব্লোরকে আপনি ভুল বুঝছেন। ও হয়তো ডাক্তারকে খুন করেনি।

তারপর হঠাৎ গলার স্বর নামিয়ে নিচু গলায় ফিসফিস করে ভেরা বললো, আচ্ছা, আপনার মনে হয়, কেউ আমাদের সব সময় লক্ষ্য করছে।

—লক্ষ্য করছে?

—হ্যাঁ।

—না, না, ওটা আমাদের দুর্বল মনের চিন্তা।

—তাহলে ব্যাপারটা আপনিও অনুভব করছেন?

কথাটা শেষ করে ভেরা কেঁপে উঠলো এবং একটু এগিয়ে গেল লম্বার্ডের দিকে, সত্যি করে বলুন না! সে আবার কেঁপে ওঠে। এমনো তো হতে পারে এই সব ব্যাপারের পিছনে রয়েছে কোন মানুষের আত্মা। সমস্ত ব্যাপারটাই অলৌকিক, যার কোন ব্যাখ্যা বুদ্ধি দিয়ে চলে না। আর অলৌকিক বলেই এত নিখুঁত ও নিষ্ঠুর।

লম্বার্ড ভেরার কথা খুব মন দিয়ে শুনে বলে, ওসব আত্মার ব্যাপারে আমার কোন বিশ্বাস নেই।

—বিশ্বাস করেন না।

—না।

—কেন?

—আমার মনে হয়, যা ঘটেছে তার পিছনে কোন মানুষ রয়েছে এবং সেই এ সব করে যাচ্ছে। তবে ঐ সব আত্মার কথা আপনি নিজে পুরোপুরি বিশ্বাস করেন?

—করি বই কী!

লম্বার্ড হাসলো, বিবেক বড় আশ্চর্য জিনিস।

—মানে? ভেরা চমকে ওঠে। আপনি কী বলতে চাইছেন?

—কিছু না ভেরা দেবী। কিছু না। আপনি তাহলে সেই শিশুর মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিলেন?

—না! না! না! ভেরা চিৎকার করে ওঠে। ও বিষয়ে কোন কথা বলার অধিকার আপনার নেই।

—তা হয়তো বলা উচিত নয়। কিন্তু আমি ভাবছি, আপনার মতো একটি মেয়ে এমন কাণ্ড করলো কী করে। ওর পিছনে কী কোন হৃদয়ঘটিত ব্যাপার ছিল, তাই না?

হঠাৎ ভেরাকে খুব ক্লান্ত দেখাতে থাকে এবং তার মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে আসে। সে বলে, হ্যাঁ, ছিল।

এ কথা শুনে একটা ঈর্ষার ছায়া পড়লো কী লম্বার্ডের মুখে? তারপরই আর এক কাণ্ড। একটা ভারি কিছু পড়ার মতো শব্দ হলো। এবং শোনা গেল একটা আর্তনাদের শব্দ।

লম্‌বার্ড বলে, শব্দটা বাড়ির দিক থেকে এলো না?

—হ্যাঁ, তাই তো মনে হলো।

—চলুন, দেখা যাক্ ব্যাপারটা কী?

—না! ভেরা উঠে দাঁড়ায়। আমি যাবো না। আর..., ভেরা লম্‌বার্ডের হাত চেপে ধরে। আপনিও যাবেন না। যেতে পারবেন না।

—তা হয় না। আমি যাবো।

—বেশ, তাহলে আমিও যাবো।

—চলুন।

নিস্তব্ধ বাড়ি। বাগান সাজানো আগের মতন। বাড়ির চারদিকে রোদ।

ওরা বাড়িতে প্রবেশ করে। তারপরই ওরা চমকে ওঠে। এমন যে একটা ঘটনা ঘটতে পারে তা ওরা ভাবতেই পারেনি এবং দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

পুব দিকের বারান্দার কাছে গিয়ে দেখে, ব্লোর মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তার হাত দুটো দু'দিকে ছাড়ানো। অনেকটা মরে পড়ে থাকা চিলের মতো তাকে দেখাচ্ছে।

ব্লোরের মাথাটা থেঁতলে গেছে। ওর কাছে পড়ে রয়েছে ভারি এক খণ্ড শ্বেতপাথর। এ থেকেই বোঝা যায়, তাকে ঐ পাথর দিয়ে আঘাত করা হয়েছে।

কিন্তু করেছে কে? ভেরা আর লম্‌বার্ড তো সমুদ্রের তীরে ছিল। আর ব্লোর একা ও বাড়িতে ছিল। তবে কী এ কাজ ডাক্তারের? যে এখনো জীবত থেকে নিষ্ঠুর ভাবে তাঁর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন?

পাথরটা সাধারণ পাথর নয়। ওর দুদিকে দুটো ভালুক খোদাই করা। তার মাঝখানে একটা ঘড়ি।

ভেরা ঐ ঘড়িটা চিনতে পারছে। ওটা তার ঘরে ছিল। তার ঘরের জানলা দিয়ে ব্লোরের দিকে ওটা কেউ ছুঁড়ে মেরেছে।

৩

ওরা থমকে দাঁড়িয়েছে।

লম্‌বার্ড ক্রুদ্ধভাবে দাঁতে দাঁত চেপে কথা বলে, ভেরা দেবী, আর কী কোন সন্দেহ আছে?

—কিসে?

—এ কাজ ঐ পাগলা ডাক্তারের। আমি তাঁকে খুঁজতে চললাম।

হঠাৎ ভেরা লম্‌বার্ডকে জড়িয়ে ধরে কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, আমার কথা শোন। পাগলামো করো না। এবার আমাদের পালা। যে খুনী সে চাইবে আমরা তাকে খুঁজি। আর সে সেই সুযোগে...। না, না, না, তুমি কোথাও যেতে পারবে না।

—তুমি বোধ হয় ঠিকই বলছো ভেরা।

—স্বীকার করছো?

—হ্যাঁ। চলো, বাইরে যাই।

ওরা গিয়ে সমুদ্রের পাড়ে বসলো। ওদের মাঝে কোন ব্যবধান

নেই। ভাগ্যই দু'জনকে এত কাছে এনে ফেলেছে। আর এখন দু' জনই দু'জনকে 'তুমি' করে বলছে।

—তোমারই জিৎ হলো ভেরা, লম্বার্ড বলে। এ ডাক্তারেরই কাণ্ড। কিন্তু ওঁ গেল কোথায়? অথচ আমরা তো কাল তন্নতন্ন করে খুঁজেছি। ভাবছি, কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারে।

—আর কাল যখন দেখা পাওনি, তখন আজও দেখা পাবে না। বিশেষ কোন একটা গোপন স্থানে...।

—হ্যাঁ, কিন্তু...।

—আমার মনে হয় ডাক্তার ঐ বাড়ির কোথাও লুকিয়ে আছে। পুরনো আমলের বাড়িতে যেমন চোরাকুঠরি থাকে, সেই রকম কোন একটা স্থান বেছে নিয়েছে।

—কিন্তু এ বাড়িটা তো হাল আমলের তৈরি।

—তাতে কী হয়েছে! তখনই হয়তো তৈরি করে নেওয়া হয়েছে, যেটা ডাক্তার জেনেছে।

—আমি তোমার কথা মানছি, কিন্তু আমরা কাল যেভাবে খুঁজেছি তাতে কিছুই দেখতে বাদ রাখিনি।

—এমন কথা কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে না।

—আমার ইচ্ছে করছে আর একবার গিয়ে সব দেখি।

—আর গিয়ে কাজ নেই। গেলে আর একজন তোমার জন্য ওৎ পেতে রয়েছে। হয়তো বা আমাকেও...।

—কিন্তু এটা আমার কাছে রয়েছে, লম্বার্ড রিভলবারটা আগের মত বার করে দেখায়।

—এত বড়াই করো না। ব্লোরও কম হুঁশিয়ার ছিল না। আর একটা কথা ভুলে যাচ্ছো কেন, ডাক্তার পাগল হয়ে গেছে। বুদ্ধিমান যদি শয়তান এবং পাগল হয়, তাহলে সে যে কোন কাজ করতে পারে। তাই যা করতে চাইছো তা করতে যেও না।

ভেরার কথার যৌক্তিকতা লম্বার্ড অস্বীকার করতে পারে না। তাই সে চুপ করে ভেরার পাশে বসে থাকে।

৪

লম্‌বার্ড ভেরাকে জিজ্ঞেস করে, আজ রাতে কী করবে ?

ভেরা কোন জবাব দেয় না।

—তুমি কিছু ভাবছো না ?

—ভেবে কী হবে ? তবে আমার খুব ভয় করছে, তারপর ভেরা বলে, আজকের আবহাওয়া ভারি সুন্দর। আমরা ঐ বাড়িতে যাবো না। চাঁদের আলোয় সারা রাত এখানেই কাটিয়ে দেবো। তা তুমি কি বলো ?

—বেশ। চলো, এখন একটু ঘুরে বেড়ানো যাক্। বসে থেকে থেকে গায়ে ব্যথা ধরে গেছে।

—চলো।

ওরা দু'জনে হাত ধরে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালো। এখন বিকেল। চরিদিকে সোনালী রোদ ভোরে আছে। সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে।

ভেরা বলে, জানো, সমুদ্রে স্নান করতে আমি দারুণ ভালোবাসি। একটু স্নান করতে পারলে বেশ হয়!

লম্‌বার্ড এ কথার কোন জবাব দেয় না। সে অন্যমনস্ক ভাবে দূরের দিকে তাকিয়ে আছে।

—এই! এত কী ভাবছো, ভেরা লম্‌বার্ডকে মৃদু ধাক্কা দেয়। আমার কথা শুনছো না ?

—অ্যাঁ! লম্‌বার্ড সংবিত ফিরে পায়।

—বলছি, আমার কথা শুনতে পাচ্ছো না ?

—আচ্ছা, ওটা কী বলো তো ? লম্‌বার্ড দূরের দিকে আঙুল নির্দেশ করে ভেরাকে দেখায়।

—কোনটা ?

—ঐ যে টিলার নিচের দিকে। সমুদ্রের দিকটায় দেখেছো ?

—কই ?...ও বোধহয় শ্যাওলা। কিংবা কোন সামুদ্রিক লতা

জলে ভাসতে ভাসতে ওখানে আটকে গেছে।

—চলো, একটু কাছে গিয়ে দেখা যাক্। আমার কিন্তু কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে।

—যাবে ? চলো। আমার কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু বলে মনে হচ্ছে না। ভেরা লম্‌বার্ডকে ধরে রয়েছে।

—দেখা যাক্, কার কথা ঠিক।

—আচ্ছা।

ওটা শ্যাওলা নয়। একটা জামা জলে ভাসছে।

একটু ভালো করে লক্ষ্য করতে ওরা দেখতে পেলো, শুধু পোশাক নয়। জলে একটা মানুষের মৃতদেহ ভাসছে। সম্ভবত জোয়ারের টানে এ পাড়ে এসে ভিড়েছে।

মৃতদেহের অনেকটা বিকৃতি ঘটেছে। সম্ভবত মাছে ঠুকরে ঠুকরে খেয়েছে। তা সত্ত্বেও চিনতে কোন অসুবিধে হলো না। ওটা হলো গিয়ে ডাক্তার আরমস্ট্রংয়ের মৃতদেহ।

ষোল

ওরা ডাক্তারের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলো। বেশীক্ষণ ওদিকে তাকাতে পারলো না। তারপর ওরা তাকায় পরস্পরের দিকে। একটি পুরুষ আর একটি নারী—লম্‌বার্ড আর ভেরা।

২

—ব্যাপারটা মন্দ হলো না, তাই না ভেরা ? লম্‌বার্ড হাসলো।

—হ্যাঁ। দ্বীপে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। শুধু আমরা দু'জন।

ভেরার মুখখানা দারুণ কঠিন দেখাচ্ছে। ফিসফিস করে কথা

বললেও সে কথার মধ্যে যথেষ্ট দৃঢ়তা রয়েছে। আর ওর চোখের দৃষ্টি থেকে যেন আগুন ঝরে পড়ছে। ও যেন নারী নয়, নাগিনী।

—ঠিক কথা ভেরা, লম্‌বার্ড বলে। শুধু তুমি আর আমি।

ভেরা তাকায় লম্‌বার্ডের দিকে। তারপর ভাবে, ছিঃ, ছিঃ, লম্‌বার্ডকে আমি এতটা বিশ্বাস করছি কী করে? ওর মুখ ভালো করে দেখলে কখনো এ কথা ভাবা উচিত নয়। ওর মুখে একটা হিংস্র ভাব ফুটে উঠেছে। আর ওর হাসিও স্বাভাবিক নয়। তার মধ্যে একটা পৈশাচিক হাসি দেখা দিয়েছে। যে হাসি দেখলে বুক কেঁপে ওঠে। অন্তরআত্মা বলে ওঠে, পালাও! পালাও!

ভেরা হঠাৎ কী মনে করে নিজেকে পাল্টে নিলো। ওর ধারালো চোখের চাউনি নিবে গেল। হাসি হলো স্বাভাবিক, মুখে ফুটে উঠলো এক অপূর্ব লাবণ্য। আর ওর বুকে যেন একরাশ মধু। আর কথা তো নয়, যেন সমুদ্রে কল্লোল, যা প্রাণ ভরে শুনতে মন চায়।

—শোন, ভেরা এগিয়ে যায় লম্‌বার্ডের কাছে। কাছে, আরো কাছে। একবারে মিশে গেল দু'জনে। আর যে নারী ও ভাবে স্বেচ্ছায় ধরা দেয়, তাকে কী কোন পুরুষ ফিরিয়ে দিতে পারে? পারে না। পারলে তো অনেক কাহিনীই রচিত হতো না। অলেখা থেকে যেত।

—এই, তোমার দুঃখ হয় না ডাক্তারের জন্য? লম্‌বার্ড ওকে দু' হাতে বুকের মধ্যে টেনে নেয়।

—হলেই বা কী করা যাবে! ভেরা চাপা গলায় প্রণয়িনীর মত কথা বলে চলে।

—চলো না, দু'জনে মিলে ওঁর দেহটা বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাই, লম্‌বার্ড ভেরার দিকে তাকায়।

—ঐ বাড়িতে?

—হ্যাঁ।

—না।

—তাহলে চলো, অন্তত জল থেকে তুলে এনে এই পাথরের উপরে শুইয়ে রাখি।

—হ্যাঁ, তা করা যেতে পারে।

—তাহলে এসো।

—হ্যাঁ, চলো।

ওরা কাজটা যতটা সহজে করতে পারবে বলে ভেবেছিল, তা কিন্তু সম্ভব হলো না। তবু ওদের চেষ্টার ত্রুটি নেই, আর ভেরাও প্রাণপণে লম্‌বার্ড'কে সাহায্য করে চলেছে। শেষে অনেক চেষ্টার পর লম্‌বার্ড' বেশ খানিকটা চড়াই বেয়ে ডাক্তারের মৃতদেহ বয়ে আনতে থাকে। আর ভেরা লম্‌বার্ড'কে জড়িয়ে ধরে রইলো, যাতে ও পা পিছলে পড়ে না যায়।

অবশেষে লম্‌বার্ড' ডাক্তারের মৃতদেহ টিলার উপর তুলে একটা বড় পাথরের উপর রাখে। পাথরটা ঝকঝকে। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট গাছ। তাতে কিছু ফুলও ফুটেছে। আর ডাক্তার যেন প্রকৃতির হাতে তৈরি বিছানায় চিরনিদ্রায় শুয়ে আছে।
টানাটানির ধকলে লম্‌বার্ড' বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। নিশ্বাসের তালে তালে চওড়া বুক ওঠানামা করছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। তাতে রোদ পড়ে চিকচিক করছে।

লম্‌বার্ড' ভাবে একবার রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নেওয়া দরকার। কিন্তু পকেটে হাত দিতে গিয়ে সে চমকে ওঠে। রিভলবারটা তো তার পকেটে নেই। পড়ে গেল নাকি কোথাও?

লম্‌বার্ডে'র দৃষ্টি যায় হঠাৎ ভেরার দিকে। অদূরে ভেরা দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে উদ্যত রিভলবার। মোহিনী আবার কালনাগিনীতে রূপান্তরিত হয়েছে। আর নিশ্বাসে যেন তার বিষ ঝরছে।

—ও আচ্ছা! লম্বার্ড বলে। এতক্ষণে বোঝা গেল তোমার ছলা-কলার অর্থ! সত্যি, তুমি আশ্চর্য! অদ্ভুত!

ভেরা এর কোন জবাব দেয় না। স্থির ভাবে লম্বার্ডের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার নিশানা লম্বার্ডের দিকে।

—ভেরা, তুমি রিভলবারটা আমায় ফিরিয়ে দাও।

—ফিরিয়ে দেবো? ভেরা খিলখিল করে দ্বীপ কাঁপিয়ে হেসে ওঠে। আর ওর হাসি যেন থামতে চায় না। এবং হাসিটা কী নিষ্ঠুর। কী ভয়ংকর শোনাচ্ছে!

—হ্যাঁ। তুমি পাগলামো করো না, লম্বার্ড ভেরাকে বোঝায়। আর তুমি আমায় পুরো মাত্রায় বিশ্বাস করতে পারো। এবং আমার অবিশ্বাসের কোন ব্যাপার তো তোমার কাছে ঘটেনি।

ভেরা সেই হাসি এখনো হেসে চলেছে। তবে তার বেগ কিছুটা শান্ত।

লম্বার্ডের সারা দেহ ঘামে ভিজে যাচ্ছে। কপাল ও গাল বয়ে দরদর করে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। ঠোঁট দুটো তার দারুণ শুকনো লাগছে। এমন কী তার নিশ্বাস নিতে পর্যন্ত কষ্ট হচ্ছে।

লম্বার্ড ভাবে, এই উন্মাদ মেয়েটাকে সে কী করে বোঝাবে যে, সে সত্যি নিরপরাধ। শুধু তাই নয় একমাত্র সেই পারে ওকে বাঁচিয়ে রাখতে।

তবু একবার শেষ চেষ্টা করলো লম্বার্ড। ভাবলো, ওর কাছে মিনতি করা বৃথা। শক্তি দিয়ে যদি কিছু করা যায়।

একটু বুঝি অন্যমনস্ক হয়েছিল ভেরা। সঙ্গে সঙ্গে লম্বার্ড ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। দাও রিভলবারটা।

—না।

ট্রিগারে চাপ পড়লো। তাতে ভেরার হাত এতটুকু কাঁপলো না। সঙ্গে সঙ্গে লম্বার্ড মাটিতে মুখ থুবড়ে লুটিয়ে পড়ে।

৩

শান্তি! উঃ, কী স্বস্তি ভেরা এখন অনুভব করছে। সেই সঙ্গে পৃথিবীকে সে যেন নতুন করে ভালোবাসতে শুরু করলো।

ভেরার এখন দারুণ ভালো লাগছে। এতক্ষণ পরে সে বুক ভরে নিশ্বাস নিলো। তার আর ভয়ের কোন কারণ নেই।

সারা দ্বীপে আর কেউ নেই। ভেরা একা, অবশ্য আছে আর

ন'টা মৃতদেহ, যা অন্যরা ভাবতেই পারবে না।

যাক্ ভেরা তো বেঁচে আছে। সে আর ও বাড়ি কিছুতেই যাবে না। সে সমুদ্রের ধারে চুপটি করে বসে রইলো।

৪

সূর্য অস্ত গেছে।

ভেরা এবার উঠে দাঁড়ায়। তবু সে বারেকের জন্য মনটা ঠিক করে নেয়। ভাবে, ও-বাড়ি বাড়ি? হ্যাঁ, আর তো কোন ভয় নেই। তার ছোট ঘরে গিয়ে ভালো করে দেখে ঘর বন্ধ করে দিলে আর ভয় কিসে! কোন ভয় নেই। বরং এই বাইরে এবং এত খোলামেলায় তার গা যেন ছমছম করছে। তার উপর আবার সন্ধে হয়ে আসছে।

তারপর ভেরা বুঝতে পারে, সে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আর ক্ষিদের কথা এতক্ষণ সে ভুলে গেছিল। এখন ক্লান্তি এবং ক্ষিদে দুই তাকে অবসন্নতার মাঝে যেন ডুবিয়ে মারতে চাইছে। তার উপর মনের ওপর থেকে কম ধকল যাচ্ছে!

ভেরা ভাবে, কাল কিংবা পরশু হয়তো বোট আসবে। ইতিমধ্যে আবহাওয়াও বেশ ভালো হয়ে উঠেছে। এবং বোট যবেই আসুক তার তো আর কোন ভয়ের কারণ নেই। সে এখন একা, কিন্তু নির্ভয়।

ভেরা বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

সূর্য অস্ত গেছে। আকাশে লাল আর কমলা রঙ একাকার হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সমুদ্রের সৌন্দর্য এখন ভেরার কাছে উপেক্ষণীয়। তবু তার দিকে একবার তাকায়।

ভেরা যেন আকাশটাকে নতুন করে দেখছে। দেখতে তার খুব ভালো লাগছে। আকাশে এত রং ছিল, কই আগে তো তার চোখে পড়েনি।

ভেরা ভাবে, এসব যেন একটা স্বপ্ন তার কাছে।

ভেরা আর ভাবতে পারছে না। সে ক্লান্ত। তার সারা শরীরে ব্যথা। চোখের পাতাগুলো ক্রমশ ভারি হয়ে উঠছে। কী ভীষণ তার

ঘুম পাচ্ছে। এখন শুধু ঘুম আর ঘুম।

একতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ায় ভেরা। ওখানে খাবার ঘর। মাঝে একটা বড় টেবিল। সেখানে তিনটে পুতুল রয়েছে।

তিনটে পুতুল ওখানে কেন। থাকা উচিত একটা পুতুল। অর্থাৎ সে। বাকী সবাই তো মৃত।

তাই ভেরা পুতুলগুলোর উদ্দেশ্যে বলে ওঠে, তোরা হিসেব মেলাতে পারিসনি! কোকা কোথাকার! থাকবে ওখানে তিনটে নয়, একটা।

ভেরা আস্তে আস্তে পুতুলগুলোর কাছে এগিয়ে যায় এবং তা থেকে দুটো পুতুল তুলে নিয়ে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বাইরের পাথরে লেগে সেগুলো ভাঙার শব্দ হলো।

ভেরা এবার আর এক কাণ্ড করলো। সে শেষ পুতুলটাকে ওখান থেকে তুলে নিয়ে আদর করলো। গালে ছোঁয়ালো। চুমু খেলো। তারপর সে বুকের মাঝে চেপে ধরে।

এরপর ভেরা চুপিচুপি বলে, আয়, তুই আমার সঙ্গে। বলে সে ওটাকে নিয়ে দোতলায় উঠতে থাকে। ক্লান্তিতে যেন তার আর পা চলছে না।

সেই ছড়াটা ভেরার মনে পড়লো—দশটা দুষ্টু ছেলের ছড়া। একে একে ন'জন হারিয়ে গেল। বাকী রইলো একজন, সে কী করলো?

ভাবে ভেরা, না, তা সে মনে করতে পারছে না। বিয়ে করলে? কাকে? হুগোকে? কিন্তু হুগো তো ভুল বুঝে তার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তবে কী লম্বার্ডকে? না, লম্বার্ড ভালো নয়। না সেই-ই লম্বার্ডকে ভুল বুঝেছিল?

না, আর ভেরা ভাবতে পারছে না। মাথা যেন আর সোজা করে রাখতে পারছে না। মাথা কী ছিঁড়ে পড়ে যাবে?

তবু কী ভাবনা ভেরা মন থেকে তাড়াতে পারছে! ভাবে, কী হলো লম্বার্ডের? কী করলো সেই একলা পুতুলটা? মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বনে চলে গেল?

ঘর খুললো ভেরা। আবছায়া আলো। তবে অন্ধকারই বেশী। কে ও, হুগো ? না লম্বার্ড ? ভেরা চেঁচিয়ে ওঠে।

একটা দড়ি ঝুলছে নিচের দিকে। তলায় ফাঁস। আর তার নিচে একটা চেয়ার।

ভেরা এগিয়ে গেল চেয়ারটার দিকে, তারপর সে চেয়ারে উঠে দাঁড়ায়। এরপর ফাঁসটা গলায় পরে নেয়।

ভেরা খিলখিল করে হেসে ওঠে। সে হাসতে থাকে। চেয়ারটা পায়ের কাছ থেকে সরে যায়।

হাতে ধরা পুতুলটা ভেরার হাত থেকে পড়ে ভেঙে যায়। এটাই শেষ পুতুল, যেটা ওর হাতে ছিল।

উপসংহার

একবারে একটা অবাস্তব ঘটনা, গাঁজাখুরি কাহিনী বলা চলে। তা কিন্তু নয়। এটা সত্যি কাহিনী, যার মধ্যে মিথ্যের কোন স্থান নেই।

কথা বলছেন দু'জন। সে দু'জন হলেন স্যার টমাস লেগ এবং মেন। টমাস হলেন অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার এবং মেন হলেন ইন্সপেক্টার। আর ওঁদের মধ্যে কথাবার্তা চলেছে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রধান দপ্তরে বসে।

টমাস বিস্ময়ের সুরে বললেন, একটা দ্বীপে দশজন লোক মারা গেছে। অথচ ঐ মৃতদেহগুলো ছাড়া অন্য কোন জীবিত লোক সেখানে ছিল না। এটা ভাবতে রীতিমত অবাক লাগে। নিশ্চয়ই এর পিছনে কোন মানুষের কারসাজি ছিল।

—স্যার, আমিও এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে একমত, মেন টমাসের কথায় মাথা নেড়ে সমর্থন জানান।

—আচ্ছা, ডাক্তারের রিপোর্ট থেকে কোন সূত্র পাওয়া গেছে ? টমাস জানতে চান।

—না স্যার, বলে মেন কাকে কি ভাবে হত্যা করা হয়েছে তার

বিবরণ দিয়ে চলেন। বলেন, ওয়ারগ্রেভ এবং লম্‌বার্ডকে গুলি করে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়েছে। ওয়াগ্রেভের মাথায় এসে গুলি লাগে, আর লম্‌বার্ডের বুকে।

রুমাল দিয়ে মুখ মুছে মেন আবার বলেন, মিস ব্রেন্‌ট এমিলিকে খুন করা হয় বিষের সাহায্যে। আর একই ঘটনা ঘটে যুবক মার্সটনের ক্ষেত্রে।

রুমালটা পকেটে রেখে মেন ফের বলেন, রজার্সের স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে বেশী মাত্রায় ঘুমের ওষুধ খাবার ফলে। আর ওর স্বামীর মৃত্যু হয় কুঠারের আঘাতে।

মেন একটু থেমে আবার বলেন, ডগলাসের মাথার খুলি ভেঙে গেছে। পিছন দিক দিয়ে কোন ধারোলা জিনিস দিয়ে তাঁকে আঘাত করা হয়েছে। আর ভেরা ক্লেথর্নের মৃত্যুর কারণ উদ্বন্ধন।

—ইস। সব বিশ্রী ব্যাপার ঘটেছে, টমাস মুখ কুঁচকে বলেন।

—হ্যাঁ স্যার।

—আচ্ছা, ডেভনের সমুদ্রতীরের লোকেরা কী বলে?

—ওরা কিছু জানে না। ওরা শুধু এটুকু খবর রাখে, আওয়েন বলে এক ভদ্রলোক ঐ দ্বীপটির মালিক।

—ওরা সাধারণত করে কি?

—ওখানকার অধিকাংশ লোকই মাছ ধরা আর মাছ চালান দেওয়ার ব্যবসা করে। দু' চারজন শুঁটকি মাছেরও কারবার করে।

—ধরা গেল, আওয়েন নামে এক ভদ্রলোক ঐ দ্বীপটির মালিক, ঐ দ্বীপটি কেনার পর নিশ্চয়ই গোছগাছ করা হয়েছিল?

—হ্যাঁ।

—সে কে করেছিল?

—আকজাক মরিস নামের একজন লোক।

—মরিস?

—হ্যাঁ।

—সে এ সম্পর্কে কি বলছে?

—কিছু না।

—মানে ?

—সে মারা গেছে।

—ও। তার সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর পাওয়া গেছে ?

—গেছে।

—কি রকম ?

—লোকটা নানারকম চোরাই কারবার করতো, কিন্তু প্রমাণের অভাবে তাকে কখনো হাতে-নাতে ধরা যায়নি।

—লোকটা কি শুধু এসবই করতো ?

—না স্যার। লোকটা এমনিতে ঠিকেদারির কাজ করতো। আসলে ওটা হচ্ছে লোকদের চোখকে ধুলো দেওয়ার জন্য।

—আচ্ছা, মরিস শেষ কবে ঐ ডেভনে গেছিল ?

—এই হত্যাকাণ্ডের আগে এবং গিয়ে সেখানকার লোকদের বুঝিয়ে এসেছে, মিঃ আওয়েনের আমন্ত্রণে কিছু লোক ওখানে আসবেন। তাদের উদ্দেশ্য নির্জনে কয়েকদিন বাস করা। এবং মিঃ আওয়েনের সঙ্গে তাঁদের বাজি হয়েছে যে, তাঁরা প্রমাণ করে দেবেন পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও কিছুদিন বাস করা চলে। কাজেই দু' চারদিনের মধ্যে ঐ দ্বীপ থেকে কোন সংকেত এলে কিছুই করার নেই। তারপর ঐ রবিনসন ক্রুশোদের সাহায্যের ব্যবস্থা মিঃ আওয়েনই করবেন।

—এতে ওরা কিছু সন্দেহ করেনি ?

—না স্যার।

—কেন ?

—ওরা সাধাসিধে মানুষ। এটাকে মনে করেছে বড়লোকদের বিচিত্র খেয়াল। তাছাড়া, আওয়েনের আগে যিনি ঐ দ্বীপের মালিক ছিলেন, তিনি খুব আমুদে প্রকৃতির লোক। তাঁকে কোটিপতি বলা চলে। তিনি প্রায়ই ওখানে পার্টি দিতেন। তাই এ ক্ষেত্রে কেউ ব্যাপারটাকে সন্দেহের চোখে দেখেনি।

এ কথা শুনে টমাস গম্ভীর হয়ে বসে থাকেন।

মেন বলেন, যে লোকটা বোটে করে ওদের ওখানে পৌঁছে দিয়েছে সে একটা কথা বলেছে।

—কি বলেছে?

—এই দ্বীপে আগে যারা পার্টি করতে যেত তারা বেশ ফুর্তিবাজ লোক ছিল।

—আর এরা?

—কিছুটা শান্ত প্রকৃতির এবং দেখলে মনে হয়, এরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত নয়। আর তাতেই ওর মনে একটু সন্দেহের ছায়া পড়েছিল।

—তাতে ও কিছু করেছিল?

—হ্যাঁ।

—কি?

—কয়েকদিন পরে ঐ দ্বীপ থেকে সাহায্যের সংকেত পেয়েই লোকজন জড়ো করে ওখানে উপস্থিত হয়। মরিসের একান্ত ভাবে বারণ করা সত্ত্বেও,আর তখনই এই লোমহর্ষক ঘটনাটা আমরা জানতে পারি।

—সাহায্যকারীরা ১২ তারিখে গিয়েছিলো?

—হ্যাঁ। অবশ্য ১১ তারিখেও ঐ ধরনের সাহায্যের সংকেত পেয়েছিল নাকি।

—তা যায়নি কেন?

—সমুদ্র তখন অশান্ত ছিল। ১২ তারিখ সকালে আবার সাহায্যের জন্য সংকেত আসে। তখন সাহায্যকারীরা ঐ দিন বিকেলে গিয়ে ওখানে উপস্থিত হয়।

—আচ্ছা, সাহায্যকারীর দল ওখানে পৌঁছবার আগে হত্যাকারী সমুদ্র সাঁতারে ডেভনে পৌঁছে পালিয়ে যায়নি তো?

—সম্ভবত নয় স্যার।

—নয় কেন বলছেন?

—প্রথমত, সমুদ্র অশান্ত ছিল।

—দ্বিতীয়ত ?

—প্রথমবার বিপদ সংকেত আসার পর থেকেই ঐ দ্বীপটার উপর নজর রাখা হচ্ছিল।

—কারা ?

—একদল ডেভনে স্কাউট ক্যাম্প করছিল। তারাই নজর রাখছিল।

একটু চুপ করে থাকার পর টমাস বললেন, ঐ গ্রামোফোনের ব্যাপারে কিছু জানা গেল ?

—হ্যাঁ স্যার।

—কি ভাবে করালো ?

—সিনেমা থিয়েটারের কাজ করে এমন একটা ফার্মকে দিয়ে করিয়েছে।

—কে করিয়েছে ?

—মরিস।

—তা ঐ ফার্ম কোন রকম ওদের সন্দেহ করেনি ?

—না। বলেছে, শৌখিন অভিনয়ের জন্য দরকার।

—আচ্ছা, ঐ রেকর্ডে যে অপরাধের কথা বলা হয়েছে, তা কতদূর সত্যি, সে সম্বন্ধে কোন খোঁজ-খবর নেওয়া হয়েছে ?

—হ্যাঁ স্যার।

—কি জানা যায় ?

—রজার্সরা মিসেস ব্রাডি নামে এক ভদ্রমহিলার বাড়িতে কাজ করতো। ওদের গাফিলতিতেই নাকি উনি মারা যান। এরপর বিচারপতি ওয়ারগ্রেভের কথা বলছি।

—ওয়ারগ্রেভের নামটা আমি সেটন মামলা প্রসঙ্গে শুনেছি। সে লোকটা যে দোষ করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে সবাই ভেবেছিল, ওর কৌঁসুলির সওয়ালে লোকটা হয়তো ছাড়া পেয়ে যাবে। যাক্, সে কথা। তারপর ?

—এরপর আপনাকে ভেরার কথা বলছি। মেয়েটি একটি বাড়িতে গভর্নেসের কাজ করতো। ঐ বাড়ির একটি ছেলে সমুদ্রে সাঁতার কাটতে গিয়ে জলে ডুবে মারা যায়। তাতে ওর কোন হাত ছিল না। ব্যাপারটা একটা নেহাত দুর্ঘটনা। বরং মেয়েটি নিজের জীবন বিপন্ন করে ওকে উদ্ধারের চেষ্টা করেছিল। ও বাড়ির সবাই মেয়েটিকে ভালোবাসতো, বিশেষ করে ছেলেটির মা।

—তারপর ?

—ডাক্তার আর্মস্ট্রংয়ের কথা বলছি। ওঁনার চেম্বার ছিল হার্লে স্ট্রীটে। তখন ওঁর বেশী বয়স নয়। তবে নাম করেছিলেন দারুণ। তখনই ওঁর চেম্বারে এক ভদ্রমহিলা অপারেশন টেবিলে মারা যায়। তাতে অবশ্য তাঁর কোন হাত ছিল না। কোন সার্জেনের ভাগ্যে না রোগী মারা যায় ? তবে এ কথা ঠিক, পরবর্তীকালে তাঁর হাত আরো ভালো হয়েছে। মোট কথা, ঐ ক্ষেত্রে ডাক্তারের কোন বাজে উদ্দেশ্য ছিল না।

—আচ্ছা।

—এরপর এমিলি ব্রেন্টের কথা বলছি। বিয়াত্রিচে টেলর নামে একটি অবিবাহিত মেয়ে তাঁর বাড়িতে কাজ করতো। কিন্তু মেয়েটি বিয়ের আগেই সন্তান-সম্ভবা হওয়ায় তিনি তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। পরে মেয়েটি আত্মহত্যা করে। মেয়েটিকে তাড়িয়ে দেওয়া কঠোর মনের পরিচয় হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তিনি অপরাধ করেননি নিশ্চয়ই।

—আইনের চোখে এসব অপরাধ নয় ঠিকই, টমাস বলেন। ঐ আওয়েন এমন কতগুলো কেস খুঁজে খুঁজে বার করেছে, যারা আইনের চোখে অপরাধী হয়নি। মনে হয় রহস্যের আসল সূত্রটা ওখানেই।

মেন আবার তাঁর তালিকায় ফিরে গেলেন। বলেন, মার্সটন জোরে গাড়ি চালাতে গিয়ে দুটো বাচ্চাকে চাপা দিয়েছিল। সেজন্য তাকে অর্থদণ্ড দিতে হয়েছে।

—হুঁ।

—জেনরেল ডগলাসের সার্ভিস রেকর্ড খুব ভালো। রিচমণ্ড তাঁর অধীনে কাজ করতো। সে একজন অফিসার ছিল। ফ্রান্সের যুদ্ধে সে মারা যায়। জেনারেলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুব ভালো ছিল। তবে যুদ্ধের সময় কমাণ্ডিং অফিসারদের ভুলে অনেক প্রাণহানি হয় বই কী! এটাও তেমন একটা ঘটনা।

—অসম্ভব নয়, টমাস মন্তব্য করেন।

—ব্লোর, এককালে পুলিসে কাজ করতো ...।

মেনকে কথার মাঝে থামিয়ে দিয়ে টমাস বলেন, হ্যাঁ, আমি ওকে চিনতাম। লোকটা কাজকর্মে তেমন সুবিধের ছিল না। তবে ফন্দিফিকির করে কয়েকটা প্রমোশন আদায় করে নিয়েছিল।

ল্যাণ্ডর সম্পর্কে খোঁজখবর তদারকির ভার ছিল ওর উপর। ও সে কাজে ফাঁকি দিয়েছিল। ফলে রিপোর্টে ফাঁক থেকে যায়। সেটা ইচ্ছে করেই হোক, বা অযোগ্যতার জন্যেই হোক। আমার বিশ্বাস, লোকটা তেমন সুবিধের ছিল না। হ্যাঁ, তারপর?

—ফিলিপ লম্বার্ড খুব সাহসী আর ডানপিটে গোছের লোক ছিল। জাহাজে করে অনেক দেশ ঘুরেছে। কোন বেআইনী কাজ করেছে বলে প্রমাণ নেই। তবে তেমন কিছু করা ওর পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

—আচ্ছা, মরিস মারা গিয়েছে বললেন না?

—হ্যাঁ।

—কবে?

—৮ই আগস্ট।

—কি ভাবে?

—বেশী মাত্রায় ঘুমের ওষুধ খাবার ফলে।

—সেটা অ্যাক্সিডেন্ট না আত্মহত্যা ছিল?

—সেটা সঠিক ভাবে বলা যাচ্ছে না।

—ব্যাপারটা এখানে গোলমেলে ঠেকছে, তাই না।

—হ্যাঁ।

টমাসের মুখে একরাশ চিন্তার ছাপ। তিনি চিন্তিত মুখে বলেন, আশ্চর্য ব্যাপার! দশ জন লোক মারা গেল। কে তাদের হত্যা করলো। কেন খুন করলো, তা কিছুই জানা যাচ্ছে না।

—স্যার, একটা কথা বলতে পারি?

—নিশ্চয়ই বলবেন।

—হত্যা কে করেছে তা জানা না গেলেও হত্যার কারণ সম্ভবত জানা গেছে। সুবিচার সম্পর্কে কারুর মাথায় কোন বাতিক চেপে-ছিল। ব্যাপারটা অবশ্য পাগলামি। তার সঙ্গে জিঘাংসাবৃত্তি মিশে মানুষটা ভয়ংকর হয়ে ওঠে। আইন যাদের শাস্তি দিতে পারেনি এ রকম বেছে বেছে সে দশটা লোক বার করে। তবে তারা সত্যিকারের অপরাধী কি না তা বলছি না।

—বলছেন না?

—না।

—তবে আমার মনে হয়,...।

—কি মনে হয় স্যার?

—মনে হয় রহস্যের সূত্রটা ধরতে পেরেছি। তা আপনি কি বলতে চাইছেন তা বলুন।

—আমার মনে হয়, ঐ দশ জনকে প্রাণদণ্ড দেবেন বলে আওয়েন স্থির করেছিল। তারপর ওদের ওখানে এনে একে একে হত্যা করে সবার অলক্ষ্যে উধাও হয়ে যায়।

—ব্যাপারটা ঠিক···।

—আপনি হয়তো ভাবছেন, আওয়েন যদি ঐ পান্না দ্বীপে গিয়ে থাকে তাহলে পালাবে কি করে?

—হ্যাঁ।

—তবে এ থেকে আমরা দুটো সিদ্ধান্তে আসতে পারি।

—কি কি।

—প্রথমত, আওয়েন ঐ দ্বীপে যায়নি।

—আর?

—ঐ দশজনের মধ্যে সে নিজেই একজন।

—ঠিক কথা।

—ঐ দ্বীপে কি হয়েছিল, তা আমরা জানি না। ভেরার একটা ডায়রি পাওয়া গেছে। এমিলি এবং ওয়ারগ্রেভও কিছু লিখে গেছেন। ব্লোরও নোট রাখতো। এই সব ঘটনার মধ্যে কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। মৃত্যুগুলো পর পর ঘটে এইভাবে—মার্সটন, রজার্সের স্ত্রী, জেনারেল ডগলাস, রজার্স, এমিলি ব্রেন্ট এবং ওয়ারগ্রেভ।

একটু থেমে মেন আবার বলেন, ভেরা ডায়েরিতে লিখেছে, ডাক্তারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সেই রাতে লমবার্ড এবং ব্লোর তাঁকে খুঁজতে বের হয়। ব্লোরও তার নোট বইতে লিখেছে, ডাক্তার নিরুদ্দেশ। এরপর আর কোন কথা জানা যাচ্ছে না। কারণ কেউ আর কোন কথা লিখে যায়নি।

মেন বাঁ পাটা ডান পায়ের উপর তুলে আবার বলেন, ওদের তিনজনকে হত্যা করে ডাক্তার জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছেন, তা কিন্তু সম্ভব নয়। কারণ ডাক্তারকে জল থেকে তুলে এনে টিলার উপর রাখা হয়েছে। তাতেই প্রমাণ হচ্ছে, নিশ্চয়ই কেউ তখনো বেঁচে ছিল।

—আবার এমনো হতে পারে, ব্লোর আর ভেরাকে হত্যা করে লম্বার্ড আত্মহত্যা করেছে, তারপর টমাস বলেন, তাহলে রিভলবারটা তার কাছে পাওয়া যেত। যেটা পাওয়া গেছে ওয়ারগ্রেভের ঘরে। এরপর তিনি মেনের দিকে তাকিয়ে ফের জিজ্ঞেস করেন, তাতে কারুর ছাপ পাওয়া গেছে ?

—হ্যাঁ স্যার।

—কার ?

—ভেরার।

—তাহলে ?

—এমন হতে পারে, ভেরা লম্বার্ডকে গুলি করে হত্যা করার পর ব্লোরকে পাথর ছুঁড়ে নিহত করে নিজে আত্মহত্যা করে। তবে এতেও একটু গণ্ডগোল থেকে যাচ্ছে।

—কেন ?

—একটা চেয়ারে ভেরার পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে। কিন্তু সেই চেয়ারটা ভেরার পায়ের নিচে পড়ে থাকতে দেখা যায়নি।

—তবে কোথায় ছিল ?

—ঘরের এক কোণে ছিল।

—তা কী করে সম্ভব হয় ?

—আমারও সেইটা বক্তব্য।

—তারপর ?

—সব শেষে ব্লোরের কথা বলছি। লম্বার্ডকে গুলি করে ভেরাকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে নিজে হয়তো আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু তাতেও একটা গোল দেখা যাচ্ছে।

—কেন ?

—ও যে ভাবে মারা গেছে তা কখনো আত্মহত্যা হতে পারে না।

—কেন ?

—একটা বড় পাথরের আঘাতে ওর মৃত্যু হয়। সে পাথরটা কে ওকে ছুঁড়ে মারবে ?

—ঠিক কথা।

—তাহলে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়াচ্ছে যে, একটা লোক দশ-জনকে হত্যা করে নিজে ঐ দ্বীপে ছিল। তারপর তার আর কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি। অথচ ডেভনের লোকদের দৃঢ় বিশ্বাস, উদ্ধারকারী দল যাবার আগে কেউ ওখান থেকে পালায় নি। সে ক্ষেত্রে …কথাটা শেষ করেন না মেন।

—সে ক্ষেত্রে কী ?

—পান্না দ্বীপের দশ জনের মৃত্যু রহস্যের কোন সমাধান করা আদৌ সম্ভব নয়। রহস্য রহস্যই থেকে যাবে।

—ঠিকই বলেছেন আপনি। সত্যি, কে এই কাণ্ডটা ঘটালো ?

পরিশিষ্ট

[একবার একটা মাছ ধরবার জাহাজ মাছের সঙ্গে একটা অ্যালুমিনিয়ামের বোতল পায়। নিচের পাণ্ডুলিপিটা সেই বোতলের মধ্যে ছিল। জাহাজের মালিক তা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে পাঠিয়ে দেয়। এখানে পাণ্ডুলিপিটা তুলে ধরা হলো।]

সম্পূর্ণ একটা বিপরীত দ্বন্দ্বে আমি অনেক দিন ধরে অনুভব করছি। বলা চলে, এটা আমার বাল্যকাল থেকে। আমার মনের মধ্যে যে বৃত্তিগুলো বাসা বেঁধেছিল, তার মধ্যে একটা হলো কল্পনা। এই কল্পনা করে আমি এক ধরনের একটা সুখ অনুভব করতাম।

এই কল্পনার বশবর্তী হয়ে আমার স্বীকারোক্তি সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলাম। সমুদ্রের ঢেউয়ে। ভাসতে ভাসতে কোথায় যাবে কে জানে। হয়তো কারুর হাতেই পড়বে না। বড় একটা পাথরের গায়ে ধাক্কা মেরে হয়তো বোতলটার মুখটা খুলে যাবে। তারপর পাণ্ডুলিপিটা জলে ধুয়ে মুছে ছিঁড়ে যাবে। সমুদ্র গর্জন হয়তো ডুবিয়ে দেবে আমার অন্তিম বক্তব্য। অবশ্য তা দিলে মন্দ হয় না।

মানুষের মন ভালো আর মন্দ দিয়ে গড়া। এটাই বোধ হয় মানুষ সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা। এর প্রমাণ আমি নিজেই।

তবে ঐ রোমান্টিক মনের পাশে বাসা বেঁধেছে নিষ্ঠুরতা। ছোটবেলা থেকে ছোট ছোট পোকা-মাকড়দের কষ্ট দিতে আমার ভালো লাগতো। এই ভাবটাই বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিত হলো এক তীব্র জিঘাংসাবৃত্তিতে।

একটা মানুষের যেমন দুটো দিক থাকে, তেমনি আমারও ছিল। ঐ বৃত্তির পাশে ছিল গভীর ন্যায়বোধ। নিরপরাধের প্রতি আমার দারুণ সহানুভূতি ছিল। তেমনি আবার নির্দয় হতাম অপরাধ এবং

অপরাধীর উপর। ফলে ন্যায়নীতি এবং দণ্ডনীতি দুই সমান ভাবে চালিয়ে গেছি।

আমার এই উপরের লেখা পড়ে কেউ নিশ্চয়ই বলছেন, এ সব করতে গেলে আইনের সাহায্য নেওয়া দরকার। হ্যাঁ, আমি তাই নিয়েছিলাম। আর আমার সব কিছু চরিতার্থ হয়েছে আইনের আঙিনার মাধ্যমে।

অনেকে আমায় আড়ালে আবডালে নিন্দে করে বলতো, এ জজ ফাঁসিয়ে তবে ছাড়বে। কথাটা কিন্তু একেবারে মিথ্যে। কেউ বলতে পারবে না কোন অপরাধী আমার কাছে অহেতুক সাজা পেয়েছে। তার বিরুদ্ধে যত প্রমাণই থাক্, আমি ঠিক আইনের সূক্ষ্ম বিচারে তাকে বার করে এনেছি। তেমনি আবার প্রকৃত অপরাধী আমার কাছ থেকে মুক্তি পায়নি। তাকে আমি তার উপযুক্ত সাজা দিয়েছি। এই যেমন ধরুন, সেটন মামলার কথা বলি। সেটন সুপুরুষ। সে তার বক্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে এতটুকু কাঁপেনি। তার উকিলও তার পক্ষে সুন্দর ভাবে কেস সাজিয়ে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করতে চেষ্টা করেছে। তখন অনেকে কেন সবাই ভেবেছে, ও বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে। কিন্তু আমার হাতে ও নিস্তার পায়নি। ওকে চরম সাজা দিয়েছে। তা নিয়ে উকিল মহল, সংবাদপত্র ইত্যাদি জায়গায় অনেক আলোচনার ঝড় এবং লেখালেখি হয়েছে। কিন্তু পরে আবার এই কেস ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তকে স্থান পেয়েছে।

যাক্, আমি আগেই বলেছি, কতগুলো দ্বন্দ্বে আমি নিয়ত ভুগছি। সেই দ্বন্দ্ব শুভ অশুভের। আমার জিঘাংসাবৃত্তি আমায় প্রায়ই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করতে বলেছে। আর বাস্তবে রূপায়িত করতে সাহায্য করেছে আমার কল্পনাপ্রসূত মন।

মনে মনে আমি কতবার নিজেকে বলেছি, আমি একটা হত্যা-লীলার আয়োজন করবো। সে হবে এমন একটা নাটক, যার রচয়িতা, প্রধান অভিনেতা, পরিচালক, প্রযোজক ইত্যাদি সব হবো আমি নিজেই। সব মিলিয়ে দাঁড়াবে একটা শিল্পকর্ম।

কিন্তু তা করতে আমি বাধা পেয়েছি। আমার ন্যায়বোধ আমায় বলেছে, তুমি তো নিরপরাধীদের সাজা দিতে পারো না। আর অপরাধীদের সাজা দেবার তো তোমার কথা নয়। সেখানে মহান আদালত রয়েছে। তুমি এমন কিছু করতে পারো না যাতে আদালতের অমর্যাদা হয়।

তবু এ চিন্তা মাথা থেকে পুরোপুরি তাড়াতে পারলাম না। তারপর একদিন অবসর নিলাম এজলাস থেকে। অখণ্ড অবসর। ভাবি, অবসরের পর আর ক'দিন বাঁচবো! অবশ্য এ ভাবার একটা সঙ্গত কারণ ছিল। আমার স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না। বেশ কিছুদিন ধরে গ্যাসট্রিকে ভুগছি। একবার অপরেশন করিয়েছিলাম, তাতে তেমন কাজ হয়নি। সেই ব্যথাটা আবার কিছুদিন ধরে অনুভব করছি। ভাবলাম, আর একবার ডাক্তারকে দিয়ে অপারেশনটা করিয়ে নিই। সেই মত গেলামও ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার সব শুনে বললেন, আর কেন। আমি তাঁর ইঙ্গিতটুকু বুঝলাম। আর আমি বেশী দিন নেই। কিন্তু থেকে থেকে আমার সেই নাটকের কথা মনে হতো। ভাবি, এ নাটক মঞ্চস্থ করার জীবনে সুযোগ কই?

একবারে হঠাৎই সেই সুযোগ এসে হাজির। একদিন আমার সঙ্গে এক ডাক্তারের কথা হচ্ছিল। তিনি কথা প্রসঙ্গে বললেন, মানুষ এমন কতগুলো অপরাধ করে যা আইন তাকে সেই অপরাধের সাজা দিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি রজার্স দম্পতির কথা তুললেন। ওরা এক ভদ্রমহিলার বাড়ি কাজ করতো। ঐ ভদ্রমহিলার আপন বলতে কেউ ছিল না। ওরা তাকে সেবা-যত্ন করতো। তাতে ভদ্রমহিলা খুশী হয়ে ওদের নামে উইল করে গেছে। তা ওরা জানতো। কিন্তু ওরা ভদ্রমহিলার স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে নারাজ। আর ওই ভদ্রমহিলার শরীর খারাপ হলে তাকে এক ধরনের একটা ওষুধ খাওয়াতে হয়। তা ওরা ওকে খাওয়ালো না। ফলে সে মারা যায়। কিন্তু ওদের দোষ ওরা লোকেদের বুঝতে দিলো না। ব্যস্তভাবে ডাক্তারের কাছে যাওয়া, উদ্বেগ, ব্যাকুলতা কান্না ইত্যাদি সবই প্রকাশ

করলো। ফলে লোকেরা কোন রকমে ওদের সন্দেহ করতে পারলো না।

এ কথা শোনার পর মনে মনে ভাবলাম, এতদিন যা চেয়েছিলাম তা পেলাম। আইন যাদের শাস্তি দিতে পারেনি, এমন লোকদের আমি খুঁজে খুঁজে বার করবো। অন্তত আমার এ ব্যাপারে দশ জন চাই। কেমন করে তা যোগাড় করলাম তা সবিস্তারে বলার দরকার নেই। শুধু এটুকু বলছি, পদ মর্যাদায় এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠায় আমার বহু লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। তাদের কাছ থেকে ঐ রকম দশটা ঘটনা বার করে নিতে আমায় তেমন বেগ পেতে হয়নি।

একদিন আমার সঙ্গে এক প্রৌঢ়া নার্সের মদ্যপানের অপকারিতা সম্বন্ধে কথাবার্তা হচ্ছিল। কথা প্রসঙ্গে এক ডাক্তারের কথা বললো, যিনি অপরেশন করার আগে মদ খেয়ে বেসামাল হয়ে পড়েন এবং সেই অবস্থায় এক রোগীকে অপারেশন করতে সে মারা যায়। তারপর অসতর্ক মুহূর্তে সে ডাক্তারের নাম, ধাম ইত্যাদি সব বলে ফেলে। সেই ডাক্তার হালেন আর্মস্ট্রং এবং থাকেন হার্লে স্ট্রীটে।

একটা ক্লাবে একদিন আমার সঙ্গে দু'জন ফৌজী অফিসারের আলাপ হয়। আমি তাদের কাছে জেনারেল ডগলাসের কাহিনী জানতে পারি।

এই ভাবে একদিন শুনেছি ফিলিপ লম্বার্ডের কাহিনী। জানিয়েছে তারই এক প্রাক্তন সহকর্মী।

এবার ব্রেন্ট এমিলির কথা বলি। উনি অতি মাত্রায় ন্যায় অন্যায় মেনে চলছেন। সেই জন্য বিয়াত্রিচে টেলারকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে বিন্দু মাত্র দ্বিধা করেন নি।

আমাদের এই সমাজে বহু ধনী ব্যক্তি আছে। তাদের মধ্যে একজন হলো অ্যান্টনি মার্সটন। এরা পয়সার জোরে ধরাকে সরা জ্ঞান করে। তেমনই একজন মানুষের কাছে আমি ওর কাহিনী শুনেছিলাম। এরা ভাবে, পয়সার দৌলতে সব কিছু কেনা যায়। সাধারণ মানুষের দাম এদের কাছে অতি তুচ্ছ।

কাজে বা কোন দায়িত্বে অবহেলাকে আমি গুরুতর অপরাধ বলে মনে করি। তাদের ক্ষমা নেই আমার কাছে। তেমনি একজন হলো পুলিশ ইংসপেক্টর ব্লোর। শুনেছিলাম ল্যাণ্ড মামলা প্রসঙ্গে।

একবার জাহাজে করে আমেরিকা যাবার পথে আমার সঙ্গে আলাপ হয় ভেরার প্রেমিক হুগোর সঙ্গে। সে একটু বেশী মদ খাওয়ার ফলে আমাকে ভেরার সব কথা বলে ফেলে। তবে সে ভেরাকে আজো ভালোবাসে। কিন্তু তার অপরাধকে সে কোনদিনই ক্ষমার চোখে দেখতে পারবে না।

এবার জানাই আমার তালিকার দশম অপরাধীর নাম। সে হলো মরিস। সে চোরাকারবারী, চোরাই মালের কারবার এবং আরো অনেক নিষিদ্ধ কাজ করে বেড়াতো। তবে সঠিক প্রমাণের অভাবে পুলিশ তাকে কখনো হাতে-নাতে ধরতে পারেনি। আর লোকের চোখকে ফাঁকি দেবার জন্যে ঠিকাদারির কাজ চালাতো।

তারপর পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। পান্না দ্বীপটা কিনে ফেললাম। এরপর সাজানো-গোছানো এবং অন্যান্য টুকটাক কাজ মরিসের সাহায্যে করলাম।

যাক্, এদিকের কাজ তো হলো এবার আসল কাজ বাকী। ওদের কী ভাবে আমন্ত্রণ জানানো যায়। এরপর ভেবে চিন্তে একটা পরিকল্পনা বার করলাম, তাতে সফল হলাম। তবে সত্যি কথা বলতে কী, ওরা রাজি হবে কিনা, এসব ব্যাপারে একটু চিন্তার মধ্যে ছিলাম। তারপর ওরা সায় জানাতে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

তারপর একই দিনে পান্না দ্বীপে হাজির হতে অনুরোধ করলাম এবং সেই তারিখটা হলো ৮ই আগস্ট। আর বলা বাহুল্য, সে দলে আমিও ছিলাম।

পান্না দ্বীপে যাবার তোড়জোড় করছি। ভাবি, এবার আমার মরিস সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। আর সে সুযোগই ওই যেন আমাকে করে দিল।

যাবার আগের দিন মরিস আমার কাছে আসে। আমি ওকে দেখে খুশীর ভান করি। বলি, আরে মরিস যে! কেমন আছো বলো? বাড়ির সব ভালো তো? আমার সামনের চেয়ারটায় বসো।

মরিস যেন আমার আন্তরিকতায় বর্তে গেল। অন্তত ওর মুখ চোখের ভাব দেখে আমার তাই মনে হলো।

সারা মুখ হাসিতে ফুটিয়ে চেয়ারে বসতে বসতে মরিস বলে, আপনাদের দয়ায় ভালোই আছি।

—আমাদের দয়া নয়, আমি ওকে খুশী করার জন্য। বলো, করুণাময় ঈশ্বরের আশীর্বাদে।

আমি জানতাম, মরিস প্রায়ই বদহজমে ভোগে এবং তার ওষুধ খাবার বাতিক আছে।

একটা কথা মনে হওয়ায় ভাবলাম, আর দেরি করা উচিত হবে না। এখুনি কথাটা ওর কাছে পাড়া দরকার। জিজ্ঞেস করলাম, তোমার শরীর কেমন আছে?

আমার প্রশ্নের উত্তরে ও নিজে থেকেই অনেক কথা বলে যায়। বলে, সত্যি, তার শরীর ভালো যাচ্ছে না। এর জন্য কাজেও বেশ ঢিলে পড়ছে। অসুখ ভালোভাবে সারানো দরকার।

—তুমি আমার একটা কথা শুনবে?

—নিশ্চয়ই।

—আমি একটা ক্যাপসুল খেয়ে এ ব্যাপারে দারুণ উপকার পেয়েছি।

—দয়া করে আমায় সেই ক্যাপসুলটার নাম বলুন।

—দাঁড়াও দেখি, ড্রয়ারে এক আধটা থাকতেও পারে। আমি ওকে ভণিতা করে বলি। আমি যে ওর জন্য ক্যাপসুল আনিয়ে রেখেছি তা ওকে আদৌ জানতে দিলাম না।

আমি চেয়ার থেকে উঠে ভালো মানুষের মতন এ ড্রয়ার সে ড্রয়ার হাতড়ে একটা ক্যাপসুল বার করে বলি, হ্যাঁ, একটা পেয়েছি।

—স্যার! আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

—না, না, এতে ধন্যবাদের কী আছে! তোমার অসুখের কথা শুনেই আমি...।

—এটা কখন খাবো? মরিস হাত বাড়িয়ে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ক্যাপসুলটা নেয়।

—রাতে শুতে যাবার আগে খাবে।

—আচ্ছা স্যার।

তারপর কিছু মামুলী কথা-বার্তার পর মরিস চলে গেল। আমি জানি, ও রাতে শোবার আগে ক্যাপসুলটা খেয়েছিল এবং সে ঘুম আর ভাঙেনি।

এরপর মনে মনে ঠিক করলাম, যারা বেশী অপরাধ করেছে তাদের আগে সরিয়ে দিতে হবে। শুধু তাই নয়, এর আগে তাদের ভয় ও মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে কুঁকড়ে রাখতে চাই। কারণ এরাই তো ঠাণ্ডা মাথায় সব অপরাধ করেছে।

প্রথমে গেল অ্যান্টনি মার্সটন এবং রজার্সের স্ত্রী। মার্সটন তার অপরাধের কথা বেশ ভালো করেই জানতো। শুধু টাকার গরমে তা ভুলে থাকতে চেয়েছে।

রজার্সের স্ত্রী যা করতে বাধ্য হয়েছিল তার মধ্যে হাত ছিল তার স্বামীর। রজার্সের স্ত্রী এবং মার্সটনের মৃত্যু কিছুটা যন্ত্রণা কম ছিল। গ্রামোফোন রেকর্ড চালাবার সময় মার্সটনের পানপাত্রে দিলাম সাইনাইড মিশিয়ে। পানপাত্রে এক চুমুক। সঙ্গে সঙ্গে সে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে।

ওদিকে রজার্সের স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ায় রজার্স যখন ব্র্যাণ্ডি এনে টেবিলে রাখে তখন সবার অলক্ষ্যে তাতে বেশী পরিমাণে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দি। তখন মৃত্যুর ব্যাপারে সবার মনে তেমন বিভীষিকা জাগেনি। ফলে কারুর মনে সন্দেহ হয়নি।

জেনারেল ডগলাসও তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে তেমন কষ্ট পাননি। আমি কখন যে তাঁর পিছনে গিয়ে মৃত্যু দূত হিসেবে দাঁড়িয়েছিলাম, তা তিনি আদৌ টের পাননি। আমি গিয়ে কাজটা খুব দ্রুত করি।

আর কখন যে আমি বারান্দা থেকে গেছি তা কেউ টের পায়নি। তবে এ ব্যাপারে আমায় খুব সতর্ক থাকতে হয়েছিল।

১০ই আগস্ট। রজার্স দাড়ি কামিয়ে নিচে গেল। কিচেনের ব্যাপারে সে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কিছু কাঠ কাটার দরকার। কিছু কাঠও কাটলো। তারপর বেড়ালের মতো নিঃশব্দে পা ফেলে কুঠারের আঘাতে ওকে চিরতরের জন্য নিদ্রা দেবীর কোলে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম।

এরপরই আমি একটা কাজ করলাম। সবাই যখন রজার্সকে খোঁজাখুঁজি করছে তখন আমি লম্বার্ডের ঘরে হাজির হই। রিভলবারটা ও কোথায় রাখে জানতাম। এটা আমি সরিয়ে ফেললাম।

তারপর পালা এলো এমিলির। ব্রেকফাস্ট টেবিলে ওঁর কফিতে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিলাম। তবে এ কাজটা আমায় সাংঘাতিক সাবধানতার সঙ্গে করতে হয়েছিল। কফি পানে ওঁ অচৈতন্য হয়ে পড়ে। আমি ঠিক এমনই একটা সুযোগ খুঁজছিলাম। পরে তিনি যখন একলা অচেতন হয়ে চেয়ারে বসেছিলেন তখন ইনজেকশন দিয়ে তাঁর শরীরে কড়া সায়নাইড সলিউশন ঢুকিয়ে দি। আর দৃশ্যকে কার্যকারী করার জন্য আমায় ছুটো মৌমাছির সাহায্য নিতে হয়েছিল। আর এ ব্যবস্থা আমি আগেই করেছিলাম।

তারপর ঘর এবং দেহ তল্লাশি চললো। রিভলবারটা পাওয়া গেল না। আর ওটা পাবে কোত্থেকে! আমি সেটা এমন একটা জায়গায় রেখেছিলাম তা বার করা ওদের সাধ্য ছিল না। ওটা রেখেছিলাম খাবার ঘরের একটা নতুন বিস্কুটের টিনের মধ্যে। রেখে আবার টিনের মুখ প্লাস্টিকের ফিতে দিয়ে লাগিয়ে দিলাম, যেমন নতুন টিনে থাকে। ফলে ওদিকে কেউ ফিরেও তাকালো না।

দলের মধ্যে আমাকে বাদ দিলে মর্যাদা বেশী ডাক্তারের। তার সঙ্গে সহজেই আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তিনি এই সব হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে লম্বার্ডকে সন্দেহ করছিলেন। সে কথা তিনি আমায় বলেছেন। আমি ইচ্ছে করে তাঁর ধারণায় সমর্থন জানিয়েছি।

এরপর নাটকের এক সুপরিকল্পিত দৃশ্যের অবতারণা করলাম—

আমি চুপি-চুপি ডাক্তারকে বললাম, ডাক্তার, হত্যাকারীকে ধরার একটা পরিকল্পনা করলে কেমন হয়?

—পরিকল্পনা ? ডাক্তার আমার মুখের দিকে তাকান।

—হ্যাঁ, আমি সায় জানাই।

—কেমন করে ?

—এরপর আমি মারা গেছি বলে পড়ে থাকবো। কেউ সন্দেহ করবে না। কারণ মৃত্যু তো একের পর এক এখানে ঘটেই চলেছে। আর তখন আপনি আমায় পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করবেন। আপনি ও কথা বললে কেউ সন্দেহ করবে না।

—তাই হবে। ডাক্তার আমার কথায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করে সায় জানালেন। কিন্তু করবেন কী ভাবে ?

—সে ব্যবস্থা আমি করছি। যেমন আজ সন্ধেয় আলো জ্বলবে না। মোমবাতির ব্যবস্থা হবে। তারপর ভেরাকে ভয় দেখাবার কথা ওঁকে বললাম। চমৎকার দৃশ্য হবে। আর আমি তখন আমার ঘরে মৃতের ভান করে পড়ে থাকবো।

ডাক্তার করলেনও তাই। ফলে আমায় কেউ সন্দেহ করলো না। রাত তখন দুটো। আমি ডাক্তারকে চুপিচুপি ডাকি, ডাক্তার, ও ডাক্তার। একটু পরে ডাক্তার বেরিয়ে আসেন, কী ব্যাপার বলুন ?

—আপনার সঙ্গে গোপনে একটু পরামর্শ আছে।

—বলুন কি বলতে চান।

—এখানে নয়।

—কোথায় ?

—সমুদ্রের ধারে টিলার আড়ালে।

—ওখানে কেন ?

—তাহলে কেউ আমাদের দেখতে পাবে না।

—ঠিক আছে, তাই চলুন।

তারপর ডাক্তার আর আমি নির্দিষ্ট জায়গায় হাজির হই। এরপর কিছু আলোচনার পর, আমি ডাক্তারের অন্যমনস্কতার সুযোগে জোরে তাকে এক ধাক্কা মারি। ডাক্তার টিলার উপর থেকে গড়াতে গড়াতে গিয়ে পড়লো জলে।

বাড়িতে ফিরে এসে গেলাম ডাক্তারের ঘরে এবং বেরুবার সময় ইচ্ছে করে একটু শব্দ করে বের হলাম। ব্লোর ভাবলো, ডাক্তারই বাইরে গেলেন। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে এক তলার সিঁড়ির নিচে লুকিয়ে পড়ি। তারপর আমায় খুঁজতে লমবার্ড এবং ব্লোর বাইরে গেলে

আমি আবার আমার ঘরে ফিরে এসে মৃতের ভূমিকায় অভিনয় করি। তবে তার আগে আমি লম্বার্ডের ঘরে পিস্তলটা রেখে আসি।

এখন বাকী ওরা তিন জন—ভেরা, লম্বার্ড এবং ব্লোর। ভেরা আর লম্বার্ড বাড়িতে ফিরতে চাইল না। ওরা সমুদ্র পাড়ে রয়ে গেল। ফিরলো একা ব্লোর। তখন আমি পাথরের ঘড়িটা নিয়ে প্রস্তুত। ও আমার কাছাকাছি আসতেই ওটা ওকে ছুঁড়ে মারলাম। একেবারে অব্যর্থ লক্ষ্য। ব্লোর চিরতরের জন্য চলে গেল। আর সত্যি কথা বলতে কি বুড়ো বয়সে এতটা যে স্থির নিশানায় ছুঁড়তে পারবো তা আগে ভাবিনি।

তারপর আমার চোখের সামনে ভেরা লম্বার্ডকে গুলি করলো। তবে সাহসে এবং শক্তিতে লম্বার্ডের উপযুক্ত ছিল ভেরা। কিন্তু পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছিল, তাতে ওদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হতে বাধ্য ছিল।

এর পরের দৃশ্যে শুধু ভেরা। যেন সে একক অভিনয় করে চলেছে। চারদিকে মৃত্যুর হাতছানি। এর আগে ন'জন মারা গেছে। সারা দ্বীপের মধ্যে সে একমাত্র জীবিত মানুষ। এটা ভাবতে গিয়ে সে দিশেহারা হয়ে পড়ছিল। ফলে সে তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

তারপর ভেরার মনে হয়, সে হুগোর প্রতি অপরাধ করেছে। তাকে প্রতারণা করেছে। তাকে ঠকিয়েছে। আর ঐ বাচ্চার মৃত্যুর জন্য তো সে সত্যি দায়ী। এর উপর সে আজ আর একটা অপরাধ করলো, যদিও সেটা বাঁচার তাগিদে। কিন্তু সেটা তো একটা অপরাধ তা অস্বীকার করলে চলবে না। লম্বার্ড এখনো টিলার উপর মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। সে ভাবতেও পারেনি যে, ভেরা তাকে গুলি চালাবে। প্রথমটা ভেবেছিলো, হয়তো তাকে মিথ্যে করে ভয় দেখাচ্ছে। তারপর ভেরা আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হলো এবং আমি ওর পায়ের নিচ থেকে চেয়ারটা সরিয়ে নিয়ে দেওয়ালের কাছে রাখলাম।

তারপর আমি পাণ্ডুলিপিটা একটা অ্যালুমিনিয়ামের বোতলে পুরে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিলাম। বোতলের মুখ সীল করে বন্ধ করা ছিল।

গতকাল 'ওরা' বলতে লম্বার্ড, ভেরা ও ব্লোর বিপদ সংকেত

পাঠিয়েছিল। উপকূল থেকে লোক আসবার আগে আমায় কাজ শেষ করতে হবে। সেটা কী কাজ তা বলছি।

আমার প্যাসনে চশমার সঙ্গে যে কর্ডটা আছে সেটা সাধারণ সুতো নয়। সেটা হলো গিয়ে ইলাষ্টিক। চশমাটকে শক্ত খাপে ভরে রাখতে হবে যাতে ইলাষ্টিক কর্ডটা বাইরে থাকে। আমার বিছানা থেকে দরজার দূরত্ব খুব একটা বেশী নয়। কর্ডের একটা দিক আলতোভাবে দরজার হাতলে লাগানো থাকবে। এর পর আমি বিছানায় গিয়ে শোব। চশমার খাপটা থাকবে আমার গায়ের তলায়। আমার বিছানা আর দরজার হাতলের যে ইলাষ্টিক কর্ডটা রয়েছে, তার সঙ্গে রিভলবারটা বেঁধে নেবো। রিভলবারে ভেরার হাতের ছাপ আছে, তাই থাকবে। আমি হাতে রুমাল জড়িয়ে রিভলবারটা ধরবো। এরপর মাথা লক্ষ্য করে ট্রিগারে চাপ দেব।

আমার ধারণা এই রকম কাণ্ড ঘটবে—আমার হাত এলিয়ে পড়বে। ঝাঁকুনি লেগে দরজার হাতল থেকে কর্ডটা খুলে যাবে। রিভলবারটা কর্ডের দোলায় ঝাঁকুনি খেয়ে ছিটকে দরজার কাছ গিয়ে পড়বে। রুমালটা খাটের এক পাশে পড়ে থাকবে। এটা যে একটা আত্মহত্যার ব্যাপার তা কেউ বুঝবে না। ওরা আমার মৃত্যুর যে বিবরণ ওদের ডায়েরিতে লিখে গেছে, তার সঙ্গে এ মৃত্যুর হয়তো হুবহু মিল থাকবে।

পান্না দ্বীপের রহস্যের কিনারা কী পুলিশ করতে পারবে ? পারা তো উচিত। একটা সূত্র তারা পেয়ে যাবে। এই দ্বীপে যে দশ জন লোক এসেছিল তাদের মধ্যে একজন কিন্তু নিরপরাধ। আর সেই কী না ন'জনের হত্যার জন্য দায়ী! এ কথাটা অন্য ভাবে নিলেও কথাটা কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এক বিন্দুও মিথ্যে নয়।

এক সময় সমুদ্র শান্ত হলে উদ্ধারকারী দল, পুলিশ এবং কিছু কৌতূহলী জনতাও আসবে। এসে দেখবে দশটি মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। আর দশটা ভাঙা পুতুল।

এই রহস্যের কিনারা তারা করতে পারবে না। রহস্য শুধু রহস্যই হয়ে থাকবে।

লরেন্স ওয়ারগ্রেভ

—